ওহে মুজাহিদ!
লাঞ্ছনাকর বন্দী জীবন নয়
সম্মানজনক মৃত্যুই
মোদের কাম্য

ওহে মুজাহিদ!

লাঞ্ছনাকর বন্দী জীবন নয়

সম্মানজনক মৃত্যুই

মোদের কাম্য।

শাইখ আব্দুল্লাহ ইবনে নাসির আর-রাশিদ

الحمد لله رب العالمين و الصلوة و السلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين

ভূমিকা

এই বার্তা উম্মাহ'র শ্রেষ্ঠ সন্তানদের প্রতি, যারা দ্বীন ও দ্বীনের মর্যাদা রক্ষাকারী, মুসলমানদের অগ্রনায়ক, হযরত আবু বকর, ওমর ও খালিদ বিন ওয়ালিদের (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) উত্তরসূরী। এই বার্তা তাঁদের প্রতি যারা উম্মাহ'র সিংহপুরুষ ও রণাঙ্গনের বীর মুজাহিদ; যাদের মাধ্যমে কুফরের দম্ভ চূর্ণ হয়েছে, ক্রুশের রাজত্ব ধুলিস্যাৎ হয়েছে ও কাফেরদের মর্যাদা ভূলুণ্ঠিত হয়েছে; সর্বোপরি আল্লাহ তা'আলা যাদের মাধ্যমে গোটা মুসলিম উম্মাহকে সম্মানিত করেছেন।

এই বার্তা সেসব মুজাহিদের প্রতি যারা কোনো নিন্দুকের নিন্দার পরোয়া না করে অবিরাম আল্লাহর পথে জিহাদ করে চলেছেন, যাদেরকে কোনো ভর্ৎসনাকারীর ভর্ৎসনা কিংবা কোনো বাধাপ্রদানকারীর বাধা জিহাদ থেকে ফেরাতে পারে না।

সম্মানিত মুজাহিদ ভাই!

সেই সত্ত্বার শপথ -যিনি ছাড়া কোনও ইলাহ নেই- আলেম, তালিবে ইলম সকলে আজ নির্দ্বিধায় এ কথা স্বীকার করবে, নিশ্চয়ই আপনারা উম্মাহ'র শ্রেষ্ঠ সন্তান, সর্বাধিক সম্মানিত, আল্লাহভীরু ও পবিত্র। আল্লাহর শরীয়াহ ও রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহ বাস্তবায়নে সদা সচেষ্ট। মুসলিম উম্মাহ আজ আপনাদের প্রতি বড়ই মুখাপেক্ষী। উম্মাহ'র শক্তি আর সম্মান যে আপনাদেরই মাধ্যমে। আল্লাহর কাছে দোয়া করি, তিনি যেন আপনাদের জিহাদ ও অন্যান্য আমলগুলো কবুল করে নেন; পাশাপাশি জিহাদের ব্যাপারে শৈথিল্য ও অসহযোগিতার যে গুনাহে আমরা লিপ্ত আছি আল্লাহ যেন তা ক্ষমা করেন।

আজ আপনাদের সাথে সংঘবদ্ধ হওয়ার সময় এসেছে। সময় এসেছে আপনাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে এ পথে ঝাঁপিয়ে পড়ার। আপনারা যে ধরণের ভীতিকর পরিস্থিতি মোকাবেলা করছেন আমাদেরও তাতে অংশীদার হওয়ার সময় এসেছে। এ পথে আপনারা যেভাবে নিজেদের জান-মাল বিলিয়ে দিচ্ছেন আমাদেরও তাতে শরিক হওয়ার সময় এসেছে।

যদি কখনো আমরা আপনাদের লড়তে বলি তাহলে এ লড়াইয়ে সর্বপ্রথম আমাদেরই ঝাঁপিয়ে পড়া উচিত। আপনাদেরকে কোনও অবস্থায়ই শত্রুর সামনে আত্মসমর্পণ না করতে বললে আমাদেরও উচিত আত্মসমর্পণ না করে শত্রুর মোকাবেলায় সুদৃঢ় প্রাচীর হয়ে লড়ে যাওয়া। আমাদের উচিত আপনাদের এমন কিছু করতে না বলা যেখানে আমরা নিজেরা পেছনে থাকবো। আপনারাই আমাদের অগ্রনায়ক; আপনাদের শ্রেষ্ঠত্ব অনস্বীকার্য। আখেরাতে আল্লাহ যেন আমাদেরকে আপনাদের সঙ্গে থাকার তাওফীক দেন এটাই আমাদের চূড়ান্ত প্রত্যাশা।

সম্মানিত মুজাহিদ ভাইয়েরা! কুফফার চক্র আজ আপনাদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ, নানা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। তারা আপনাদেরকে কারারুদ্ধ করে কিংবা হত্যা করে জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহ'র অগ্রযাত্রা থামিয়ে দিতে চায়। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা স্বীয় দ্বীনকে অবশ্যই পূর্ণাঙ্গতায় পৌঁছাবেন যদিও দ্বীনের শত্রুরা তা অপছন্দ করে।

সুতরাং আপনাদের প্রতি আমাদের বার্তা হল, কোনো অবস্থায়ই তাগুতের কাছে আত্মসমর্পণ করবেন না; নিজেকে তাদের হাতে সঁপে দিবেন না; কিছুতেই তাদের হাতে ধরা দিবেন না; আপনাদের ওপর তাদের কর্তৃত্ব কখনোই প্রতিষ্ঠিত হতে দিবেন না। বরং আল্লাহর ওপর পূর্ণ আস্থা ও ভরসা রেখে তাদের বিরুদ্ধে ক্বিতাল চালিয়ে যাবেন। এরপর বেঁচে থাকলে প্রকৃত সম্মান ও মর্যাদা নিয়ে বেঁচে থাকবেন, না হয় সম্মানের সাথে শাহাদাতের মৃত্যুকে আলিঙ্গন করবেন। মনে রাখবেন, লাঞ্ছনার জীবনের চেয়ে সম্মানজনক মৃত্যু অনেক অনেক শ্রেয়।

গ্রেফতারী কিছুতেই কাম্য নয়

গ্রেফতার হওয়ার অর্থ হলো নিজেকে কাফেরদের কর্তৃত্বে দিয়ে দেওয়া। আর ইসলামে একজন মুসলমানের জন্য স্বেচ্ছায় কাফেরদের কর্তৃত্ব বরণ করা হারাম। হিজরতের বিধান তো ইসলামে এ জন্যই দেয়া হয়েছে। একই কারণে কোনো কাফেরকে মুসলমানদের নেতা বানানো বা কোনো কাফের মুসলিম গোলামের মনিব হওয়ার বৈধতা ইসলামে নেই। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا [٤:١٤١]

অর্থ: আল্লাহ তা'আলা মুমিনদের ওপর কাফেরদের কোনো কর্তৃত্ব রাখেননি। (সূরা নিসাঃ-১৪১)

হাদীস শরীফে এসেছে:

الإسلام يَعلُوْ ولا يُعلَى عليه

অর্থাৎ: ইসলাম সর্বদা উঁচুতে থাকবে, নিচু হবে না।

উপরোক্ত কায়দা থেকে অধিকাংশ ওলামায়ে কেরাম একটি পরিস্থিতিকে ব্যতিক্রম বলেছেন। এ ব্যাপারে ইমাম বুখারী রহ. একটি অধ্যায় কায়েম করেছেন। অধ্যায়টির নাম:

باب هل يستأسر الرجلُ؟ ومن لم يستأسر

অর্থাৎ: "কেউ বন্দীত্ব বরণ করবে, কি করবে না"? এ অধ্যায়ে তিনি হাদীদুল আশারাহ বা দশ সাহাবীর হাদীসটি উল্লেখ করেছেন; যে দশজনকে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গোয়েন্দা বানিয়ে পাঠিয়ে ছিলেন। পথিমধ্যে তাদেরকে বনী লিহয়ানের কিছু লোক ঘিরে ফেলে ভয়-ভীতি দেখাতে থাকে। পরিস্থিতি বেগতিক দেখে সাহাবীদের সেই দলটি একটি টিলার ওপর আশ্রয় নেন। এক পর্যায়ে বনী লিহয়ানের লোকগুলো দশ জনের ওই বাহিনীকে প্রস্তাব দেয় যদি তাঁরা নিচে নেমে এসে আত্মসমর্পণ করে তাহলে তারা (মুশরিকরা) তাঁদেরকে নিরাপত্তা দিবে। তখন সাহাবীদের কেউ কেউ মুশরিকদের প্রতিশ্রুতির ওপর নেমে আসেন। কিন্তু হযরত আসেম বিন সাবিত রাযি. –যিনি ওই বাহিনীর আমীর ছিলেন- তিনি বললেন, আমি কাফেরদের নিরাপত্তা নিয়ে আত্মসমর্পণ করবো না। ফলে তিনি প্রাণপণ লড়াই করে শেষ পর্যন্ত শহীদ হয়ে যান।

হাফেয ইবনে হাজার রহ. এ হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন,

"বন্দী ব্যক্তির জন্য কাফেরের নিরাপত্তা গ্রহণ না করার অবকাশ রয়েছে; এমনকি নিহত হওয়ার আশংকা থাকলেও আত্মসমর্পণ না করার সুযোগে আছে। কেননা তাদের কাছে আত্মসমর্পণের অর্থ হলো, তার ওপর কাফেরদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়া ও তাদের আইন-কানুন প্রয়োগ হওয়া। তবে এটা ওই ক্ষেত্রে যখন সে 'আযীমত' তথা শরিয়তের কঠোর নীতি অবলম্বনের ইচ্ছা করবে। অন্যথায় যদি সে 'রুখছত' তথা শরীয়তের সহজ নীতি অবলম্বনের ইচ্ছা করে তাহলে তার জন্য কাফেরের নিরাপত্তা গ্রহণ করার অবকাশ আছে। তবে দু'টোর যে কোনোটি বেছে নেয়ার এখতিয়ার যে রয়েছে, এ ব্যাপারে অধিকাংশ ওলামায়ে কেরাম একমত। তবে ইমাম আহমদ রহ. থেকে একটি বর্ণনা পাওয়া যায়, যেখানে তিনি আত্মসমর্পণকে হারাম বলেছেন। তিনি বলেনঃ

لا يُعجبني أن يستأسر، يقاتل أحب إليَّ، الأسر شديد ولا بد من الموت .

"বন্দী হওয়া আমার কাছে সংগত মনে হয় না; বরং শত্রুর বিরুদ্ধে লড়ে যাওয়াই আমার কাছে বেশি পছন্দনীয়। কারণ, বন্দী জীবন খুবই কঠিন। মৃত্যু তো একদিন আসবেই।"

অধিকাংশ ওলামায়ে কেরাম যদিও দু'টোর যে কোনোটি বেছে নেয়ার এখতিয়ার দিয়েছেন কিন্তু 'আযীমত' তথা শরিয়তের কঠোর নীতি অবলম্বন করে কাফেরের হাতে আত্মসমর্পণ না করাই যে উত্তম, এ ব্যাপারে কারো দ্বিমত নেই। কেননা আত্মসমর্পণ করার ক্ষেত্রে বড় ধরনের ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়।

শহীদ ইউসুফ উয়াইরী রহ. বলেনঃ

"ولأن استسلام المجاهد مع ما فيه من الانهزام وشيء من الذل وما فيه من كسر قلوب المسلمين ، وثلمةٍ في موقف المجاهدين ، وما فيه من سرور العدو وغبطته وشماتته بالمجاهدين والمسلمين عامة ورفع معنوياته ، مع ما في الاستسلام من جميع تلك المفاسد إلا أنه أيضاً لا يحقق للمستسلم ما خاف على نفسه منه وهو الموت فإنه سيصبر إلى قِتلة أشنع وأذل مما سيقتل عليها لو لم يستسلم هذا إن لم يمر قبل ذلك على التعذيب والتنكيل وانتزاع المعلومات التي قد تضر غيره" اهـ

"... ... তাছাড়া কোনো মুজাহিদ যদি শত্রুর হাতে আত্মসমর্পণ করে তাহলে একদিকে যেমন রয়েছে পরাজয়, লাঞ্ছনা, মুসলমানদের মনোবলে ভাঙ্গন তৈরি ও মুজাহিদীনের অবস্থানে ফাটল সৃষ্টি করার মতো বিষয়; অপরদিকে মুজাহিদীনসহ সকল

মুসলিমের ব্যাপারে শত্রুপক্ষকে খুশি করার বিষয়ও। এর ফলে শত্রুপক্ষের মনোবলকে আরও চাঙ্গা করা হয়। এতকিছুর পরও আত্মসমর্পণের মাধ্যমে সে যেই মৃত্যু থেকে বাঁচতে চাচ্ছিল তা থেকেও নিস্তার নেই। বরং এক্ষেত্রে সে আরো জঘন্য লাঞ্ছনাকর মৃত্যুর সম্মুখীন হবে। তাছাড়া রয়েছে তথ্য ফাঁস হওয়ার মতো ভয়ংকর বিষয়, যা অন্য ভাইদেরকেও আক্রান্ত করবে।”

মোট কথা, ওপরের ঘটনায় সাহাবায়ে কেরাম রাঃ যা করেছেন তার খবর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে পৌঁছেছিলো। সেখানে দু'টি দিক ছিলো; এক. প্রাণপণ লড়ে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করা। দুই. তাদের হাতে বন্দি হওয়া। উক্ত ঘটনা থেকে উভয় অবস্থার বৈধতা প্রমাণিত হয়। কেননা এর বিপক্ষে কোনো দলীল আমরা পাই না। সুতরাং বর্তমানেও যদি কেউ এমন পরিস্থিতির সম্মুখীন হয় অর্থাৎ হত্যা বা বন্দিত্ব থেকে পলায়নের কোনো সুযোগ না থাকে সেক্ষেত্রে এ হাদীসের আলোকে এ দুটো পরিস্থিতির কোনো একটি গ্রহণ করা যাবে। তবে ওপরের ঘটনায় যারা মুশরিকদের নিরাপত্তা প্রদানের প্রতিশ্রুতির প্রেক্ষিতে নেমে এসেছিলেন তাঁদের আত্মসমর্পণ ও বর্তমান সময়ের তাগুতের কাছে আমাদের আত্মসমর্পণের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। সাহাবীদের মধ্যে যারা নেমে এসেছিলেন তাঁদেরকে নিরাপত্তা প্রদানের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিলো। আর এটা সম্পূর্ণ বৈধ প্রতিশ্রুতি। সেখানে দোষনীয় যতটুকু ছিলো তা হলো- নিজেদেরকে কাফেরদের কর্তৃত্বে দিয়ে দেওয়া। কিন্তু তাদের ওপর কাফেরদের আইন-কানুন প্রয়োগ করা হবে এ কথার প্রেক্ষিতে তাঁরা নেমে আসেননি। পক্ষান্তরে বর্তমান সময়ে যারা বন্দিত্ব বরণ করে নেয় তাঁদের এ কথা খুব ভালোভাবেই জানা থাকে যে, তারা নিজেকে তাদের কর্তৃত্বে দেওয়ার পাশাপাশি তাগুতের আইন-কানুন তাদের ওপর প্রয়োগ করার সুযোগ তৈরি করে দিচ্ছে। সুতরাং ওখানে বন্দিত্ব বরণ করে নেয়া বৈধ হলেও এখানে বৈধ হবে না।

সারকথা হলো, নিজেকে কাফেরের হাতে কেবল তখনই সোপর্দ করা যাবে যখন নিম্নোক্ত শর্তগুলো পাওয়া যাবে।

- পলায়ন থেকে অক্ষম হলে।
- বন্দি হলেও দ্বীনের ব্যাপারে কোনো ফেতনার শিকার হবে না বলে নিশ্চিত হলে।
- মুজাহিদীনের জন্য ক্ষতির কারণ হবে এমন কোনো তথ্য ফাঁস হওয়া থেকে নিরাপদ মনে হলে।
- নিজের জীবনের নিরাপত্তার ব্যাপারে আস্থাশীল হলে বা তাদের দ্বারা সে আক্রান্ত হবে না এ ব্যাপারে প্রবল ধারণা থাকলে।

সুতরাং কারো কাছে যদি মুজাহিদীনের গোপন তথ্য থাকে এবং শত্রুপক্ষ যদি নির্যাতন করে বা যাদু প্রয়োগ করে সেসব তথ্য বের করে নেয়ার সমূহ সম্ভাবনা থাকে, এক্ষেত্রে তাগুতের হাত থেকে পলায়নের সুযোগ থাকলে নিজেকে তাদের হাতে সমর্পণ করা জায়েজ হবে না। বরং শায়খ মুহাম্মাদ বিন ইবরাহীমসহ আরও অনেকের ফতোয়া হলো, এক্ষেত্রে তার জন্য আত্মহত্যা করাও বৈধ।

আমি আমার “নাবযাতুন ফীল আমালিয়্যাতিল ইশতিশহাদিয়্যা” কিতাবে এ ব্যাপারে কিছু দলিল উল্লেখ করেছি।

সুতরাং গোপন তথ্যের গুরুত্ব বিবেচনা করে স্বেচ্ছায় মৃত্যুকে আলিঙ্গন করা আর নিজেকে কাফেরদের হাতে সোপর্দ করার মাধ্যমে গোপন তথ্য ফাঁস করে সকলকে ক্ষতির সম্মুখীন করা- উভয়টি কি এক হতে পারে?

এখন মূল প্রসঙ্গে আসি। বর্তমান সৌদি সরকার একটি মুরতাদ ও কাফেরদের এজেন্ট সরকার। এই সরকার কাফেরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছে। মুশরিক ও কবর পূজারীদেরকে সহায়তা করছে। আল্লাহর নাযিলকৃত আইন পরিপন্থী বিচারিক আদালত কায়েম করেছে। তাগুতের কাছে বিচার চাচ্ছে। ওরা দ্বীনের সাথে বিদ্রুপকারীদের ব্যাপারে নিশ্চুপ। এছাড়াও তাদের মাঝে আরও বিভিন্ন ঈমান ভঙ্গের কারণ বিদ্যমান। বরং ঈমান ভঙ্গের প্রতিটি বিষয়ে তারা কয়েক ধাপ এগিয়ে। কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব করেই ক্ষান্ত হচ্ছে না, বরং বন্ধুত্বের যৌক্তিকতা সবার সামনে তুলে ধরছে। শুধু তাই নয়, বরং এটাকে গর্বের সাথে ফলাও করে প্রকাশ করছে। অপরদিকে যারা কাফেরদের বিরোধীতা করে এ সরকার তাদের বিরোধীতায় নেমেছে। আর যারা কাফেরদের তোষামোদ করে তাদের সাথে এদের ঘনিষ্ঠতা রয়েছে। অপরদিকে যারা কাফেরদের সাথে বারাআতের (সম্পর্ক ছিন্নের) ঘোষণা দেয় অথবা সেই সত্য প্রকাশ করে যা তারা অপছন্দ করে, তাঁরা ওদের নির্যাতনের যাতাকলে পিষ্ট হয়। তাদের ঈমান ভঙ্গের যত কারণ রয়েছে তার সামান্য কিছুই এখানে তুলে ধরা হলো।

যদি সৌদি সরকার একটি সার্বভৌম সরকার হতো (অর্থাৎ ইউরোপ, আমেরিকার কথায় উঠবস না করতো) তবুও এ সরকারের কাছে আত্মসমর্পণ করা জায়েয হতো না। কিন্তু যেখানে এ সরকার আমেরিকার এজেন্ট বা প্রতিনিধি হয়ে বসে আছে সেক্ষেত্রে

তার কাছে আত্মসমর্পণ কীভাবে বৈধ হতে পারে? তার কাছে আত্মসমর্পণ করা মানে আমেরিকার কাছেই আত্মসমর্পণ করা। কেননা মুজাহিদদেরকে আটকের নির্দেশ আমেরিকাই দেয় এবং এর দ্বারা সে-ই ফায়েদা লুটে। আদ্যোপান্ত তার সুরক্ষা ও স্বার্থ রক্ষাই এসবের উদ্দেশ্য। তাছাড়া বন্দীদের কাছ থেকে পাওয়া তথ্যগুলো এদেরই মাধ্যমে যথাসময়ে আমেরিকার কাছে পৌঁছে যায়। কোনো এক ত্বাগুত তো এটা গর্বের সাথে বলেও ফেলেছে; সম্ভবত তার নাম- বন্দর বিন সুলতান। সে বলেছে, অধিকাংশ সেল এবং জিহাদী কর্মকান্ড ধ্বংস করা হয়েছে সৌদি কারাগারে আটক বন্দীদের দেয়া তথ্যের ভিত্তিতেই ।

তেমনিভাবে কোনো মুজাহিদ সৌদি সরকারের কাছে আত্মসমর্পণ করার অর্থ হলো নিজেকে হামিদ কারজাইয়ের কাছে সমর্পণ করা, অথবা কুয়েত, মিশর, ইয়েমেন ও আমেরিকার তাবেদার অন্য যে কোনো সরকারের কাছে আত্মসমর্পণ করা; এদের কারো মাঝে তেমন কোনো পার্থক্য নেই। মু'মিনদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে গিয়ে আল্লাহ তাআলা বলেন, তারা ঈমানদারদের প্রতি কোমল ও কাফেরদের বিরুদ্ধে কঠোর।

তর্কের খাতিরে যদি ধরেও নেয়া হয় যে, যে সরকার মুজাহিদদেরকে গ্রেফতার করতে চাচ্ছে তা মুসলিম সরকার; তাদের ঈমান বিধ্বংসী কর্মকান্ডের কথা না হয় বাদই দিলাম, তারা আমেরিকার চর হয়ে মুসলমানদের গ্রেফতার করছে- এসব কিছু থেকে না হয় দৃষ্টি ফিরিয়ে রাখলাম, তারপরও যে কারো কাছে নিজেকে সঁপে দেওয়া আবশ্যক নয়, এমনকি সে যদি রাষ্ট্রপ্রধানও হয়; যখন জানবে, তার বিরুদ্ধে ওয়ারেন্টকারী একজন জালেম।

যদি কেউ অন্যায়ভাবে কারো সম্পদ ছিনিয়ে নিতে আসে তাহলে হাদীসের ভাষ্যমতে ওই জালেমের সাথে ক্বিতাল করা বৈধ। হাদীসে এসেছে, এক সাহাবী রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে প্রশ্ন করলেনঃ

أرأيت لو أنَّ رجلاً جاءني يُريد أخذ مالي؟ قال : فلا تعطه. قال : فإن قاتلني؟ قال : قاتله. قال فإن قتلني؟ قال : فأنت شهيد. قال : فإن قتلته؟ قال : فهو في النار.

"কেউ আমার সম্পদ ছিনিয়ে নিতে এলে আমি কী করবো? রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তাকে দিবে না। বললেন, যদি সে আমার সাথে লড়াইয়ে লিপ্ত হয়? রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমিও তার সাথে লড়াই কর। ওই সাহাবী বললেন, যদি সে আমাকে হত্যা করে? বললেন, তাহলে তুমি শহীদ। অতঃপর সাহাবী বললেন, যদি আমি তাকে হত্যা করি? রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সে জাহান্নামে যাবে।"

মুসলমান ইসলামের সম্মানে সম্মানিত। গাইরুল্লাহর দাসত্ব থেকে সে মুক্ত। অতএব কেউ যদি তাকে মহান আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করার কথা বলে ও তাঁর বিধানের সামনে বশ্যতা স্বীকার করতে বলে, তাঁর দিকে সে স্বেচ্ছায় স্বপ্রনোদিতভাবে ছুটে যাবে। পক্ষান্তরে আল্লাহর বিধান ও শরিয়ত ছেড়ে যে তাকে কোনো রাষ্ট্রপ্রধান বা সাম্রাজ্যের দিকে আহবান করবে বা কোনো দাপটশীলের দাপট ও অন্যায়ের দিকে আহবান করবে, সেক্ষেত্রে নিজেকে সেই দাপটশীলের কাছে সোর্পদ করা ও তার কাছে আত্মসমর্পণ করা আবশ্যক নয়। যেখানে অন্যায়ভাবে কাউকে নিজের সম্পদই দিবে না, সেখানে নিজের জীবন কীভাবে দিতে পারে?

أقسمت : إمَّا أن أعيش بعزةٍ بكرامتي ، أو أن تُدَقَّ عظاميا

আল্লাহর শপথ! হয়তো সম্মানের সাথে বাঁচবো, নয়তো (লড়াই করে) দেহের অস্থিগুলো চূর্ণ করে ফেলবো।

ক্ষেত্রবিশেষে শাসকের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হওয়া প্রশংসনীয়

হযরত আমর বিন আস রাযি. রোমকদের একটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করে তাদের প্রশংসা করেছেন; তিনি যে বৈশিষ্ট্যের ওপর তাদের প্রশংসা করেছেন বর্তমানে এটাকেই অনেকে শাসকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও ফেতনা বলে মনে করে থাকে। তাদের কাছে এমন যে কোনো কর্মই ফেতনা হয়ে যায় যা জালিম শাসকের মর্জি মতো হয় না। অথচ শাসক গোষ্ঠী শুধু জালেম হলেও হতো; বরং বহু নামধারী মুসলিম শাসক বর্তমানে মুরতাদ ও কাফের বনে বসে আছে। এরপরও জুলুমের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবে দূরের কথা বরং এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হওয়াকেও অনেকে ফেতনা মনে করছে।

সহীহ মুসলিমের এক হাদীসে এসেছেঃ

جاء في صحيح مسلم أنَّ المستورد قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : "تقوم الساعة والروم أكثر الناس" ، قال عمرو بن العاص : أبصر ما تقول. قال : أقول ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلَّم ، قال عمرو : لئن قُلتَ ذلك إنَّ فيهم لخصالاً أربعةً : إنَّهم لأحلم الناس عند فتنةٍ ، وأسرعهم إفاقةً بعد مصيبة ، وأوشكهم كرةً بعد فرّةٍ ، وخيرهم لمسكينٍ ويتيمٍ وضعيفٍ ، ثمَّ قال : وخامسةٌ حسنةٌ جميلةٌ : وأمنعهم من ظلم الملوك.

হযরত মুসতাওরিদ রাযি. বলেন, আমি রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি।, **যখন কেয়ামত সংঘটিত হবে তখন পৃথিবীতে রোমকদের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি হবে।** হযরত আমর বিন আস রাযি. (আশ্চর্য হয়ে) বললেন, কী বলছো বুঝে শুনে বলো! তখন মুসতাওরিদ রাযি. বললেন।, আমি রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে যা শুনেছি তাই বলছি। তখন হযরত আমর বিন আস রাযি. বললেন, যদি তুমি এটা বলতে ..., তাদের মধ্যে চারটি ভালো গুণ আছে:

১। তারা যে কোনো ফেতনায় খুব সহনশীলতার পরিচয় দেয়।

২। যে কোনো দূর্যোগের পর খুব দ্রুত ঘুরে দাঁড়ায়।

৩। পরাজয়ের পর খুব দ্রুত পুনরায় হামলা করতে উদ্যোগী হয়।

৪। অসহায়, অনাথ ও দূর্বলের পাশে দাঁড়ায়।

এরপর বলেন, পঞ্চম আরেকটি বৈশিষ্ট্য তাদের রয়েছে যা বড়ই চমৎকার; " তারা শাসকগোষ্ঠীর জুলুম একদমই মেনে নিতে পারে না।"

লক্ষ্য করুন, হযরত আমর বিন আস রাযি. শাসকগোষ্ঠীর নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হওয়ার বিষয়টি উল্লেখ করে তাদের কীভাবে প্রশংসা করলেন! হাদীসের এ অংশটি ভিন্ন শব্দেও এসেছেঃ

وأقلُّهم صبرًا على جور الملوك

অর্থাৎ তারা শাসকগোষ্ঠীর নির্যাতন একদমই সহ্য করে না।

এখানে আরেকটি বিষয়ও লক্ষ্যনীয়; তাদের পাঁচটি গুণের প্রথমটি ছিলোঃ

إنَّهم لأحلم الناس عند فتنةٍ

অর্থাৎ "যে কোনো ফেতনায় তারা খুব সহনশীল"। অপরদিকে পঞ্চম গুণটি হলোঃ

وأمنعهم من ظلم الملوك

অর্থাৎ "শাসকগোষ্ঠির নির্যাতনের বিরুদ্ধে তারা প্রতিবাদী।"

বোঝা গেল, হযরত আমর রাযি. নির্যাতনের মুখে শাসকের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হওয়াকে ফেতনার সময় তাদের সহনশীলতার পরিপন্থি মনে করেননি।

এ হাদীস দ্বারা দলিল দেয়া সঠিক নয়

" اسمع وأطع وإن أخذ مالك وجلد ظهرك "

শাসকের কথা শুনো এবং মানো, যদিও সে তোমার সম্পদ ছিনিয়ে নেয় বা তোমার পিঠে কষাঘাত করে। উক্ত হাদীস দ্বারা দলীল দেওয়া মারাত্মক একটি ভুল।

যদি সেই শাসকগোষ্ঠীকে মুসলিম বলে ধরেও নেয়া হয় তারপরও এ হাদীসে নিজের জান-মাল তাদের হাতে অর্পণ করার নির্দেশ দেয়া হয়নি। তাছাড়া অপর হাদীসে যেখানে নিজের সম্পদ রক্ষার্থে লড়াই করার অনুমতি দেয়া হয়েছে- তার সাথে শাসকের আনুগত্যের হাদিসটি সাংঘর্ষিক নয়। কারণ, আনুগত্য বৈধ বিষয়ে হয়, যেখানে আল্লাহর নাফরমানী হবে না। সুতরাং শাসক যদি

অন্যায়ভাবে তাকে জান বা মাল সমর্পণ করতে বলে সেক্ষেত্রে তার আনুগত্য আবশ্যক নয়। হ্যাঁ, ন্যায্যভাবে কিছু চাইলে অবশ্যই দিতে হবে। উপরের হাদীসটির বর্ণনাভঙ্গি সম্পূর্ণ এ হাদীসটির মতইঃ

وإن تأمَّر عليكم عبدٌ

অর্থাৎ (তোমরা আনুগত্য কর) যদিও কোনো গোলাম তোমাদের শাসক হয়ে যায়। আরেক বর্ণনায়ঃ

وإن كان عبدًا حبشيًّا

(তোমরা আনুগত্য কর) যদিও শাসক হাবশী গোলাম হয়। এখানে হাদীসে এ কথা বলা হচ্ছে না যে, তোমরা গোলামকে শাসক বানানোর চেষ্টা কর বা শাসক হওয়ার মতো স্বাধীন যোগ্য ব্যক্তি থাকার পরও গোলামের জন্য শাসক হওয়ার পথ উন্মুক্ত রাখো। এখানে যে বিষয়টি এসেছে তা হলো, যদি এমন ব্যক্তিও শাসক বনে যায় তাহলে তারও আনুগত্য কর।

وإن جلد ظهرك وأخذ مالك

"যদিও সে তোমার সম্পদ ছিনিয়ে নেয় বা তোমার পিঠে কষাঘাত করে।"

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর এ বক্তব্যে সম্পদ দিয়ে দেয়ার বা পিঠ পেতে দেয়ার প্রতি উৎসাহিত করেননি, বরং তিনি যা বলতে চাচ্ছেন তা হলো, শাসক যদি তোমার সাথে এ ধরণের অন্যায় আচরণ করেও থাকে তারপরও তুমি পরবর্তীতে বৈধ বিষয়ে তার আনুগত্য থেকে বের হয়ো না এবং তোমার সাথে করা সেই অন্যায় আচরণের কারণে তুমি তাকে রাষ্ট্রপ্রধানের দায়িত্ব থেকে নামানোর চেষ্টা করো না। কারণ, আনুগত্য থেকে বের হওয়া ও তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা শুধু তখনই জায়েয যখন তার পক্ষ থেকে স্পষ্ট কুফরী পাওয়া যাবে।

একজন মুজাহিদের জানা থাকা উচিত, শাসকগোষ্ঠী তাকে এমন বিষয়ে গ্রেফতার করতে চাইছে যে বিষয়টি নিঃসন্দেহে আল্লাহর ইবাদত। বরং তা এমন এক বিধান যা ফরযে আইন বা অবশ্য পালনীয়। দ্বিতীয় কথা হলো, তারা অধিকাংশ বন্দীদের কোনো বিচার না করেই মাসের পর মাস অন্যায়ভাবে বন্দী করে রাখে। পরবর্তীতে প্রচন্ড শাস্তির মুখে এমন বিষয়ে তার থেকে মিথ্যা স্বীকারোক্তি নিয়ে নেয় যা সে করেনি। এতকিছুর পরও সবচেয়ে বড় বিষয় হলো, তারা আল্লাহর আইন ব্যতিত ভিন্ন আইনে তাদের বিচার পরিচালনা করে। সেখানে তাই ঘটে যা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পক্ষ হতে স্বরাষ্ট্র সচিব কামনা করে এবং বিচারকদের ধ্যান-ধারণা মোতাবেকই বিচার হয়।

১৪১৫ হিজরীতে যে সকল মাশায়েখ, দাঈ, সমাজ সংস্কারক ওলামায়ে কেরাম ও তাদের সাথীদের গ্রেফতার করা হয়েছিলো তাদের ওপর চালানো নির্যাতন আমরা প্রত্যক্ষ করেছি। বিনা অভিযোগে, বিনা বিচারে তাদের ওপর নির্যাতন করা হয়েছে। নির্যাতনের পর যাদেরকে মুক্তি দেয়া হয়েছে তাদেরকে শাসকদের বিরুদ্ধে টু শব্দটুকু না করার শর্তেই মুক্তি দেয়া হয়েছে। অল্প কয়েকদিন হলো সাঈদ বিন যুয়াইর মুক্তি পেলেন। তার মতো কারাগারে আরও অনেকে আছেন যাদের বিরুদ্ধে না কোনো মামলা হয়েছে, না কোনো ফায়সালা হয়েছে। যেমন আবু সুবাই ওয়ালীদ আস সিনানী -আল্লাহ তাঁর মুক্তি ত্বরান্বিত করুন, হক্কের ওপর তাকে দৃঢ় রাখুন এবং তাঁর প্রতিদানকে বহু গুণ বাড়িয়ে দিন-। বন্দীদের অধিকাংশের ওপর কারাগারের শারীরিক নির্যাতন তাদের মতাদর্শ, চিন্তা-চেতনা ও কথাবার্তা পাল্টে দিয়েছে। এমনকি তাদের নীতি-নৈতিকতা পর্যন্ত পাল্টে দিয়েছে। যারা বের হয়েছেন তাদের অনেকের মাঝে আশ্চর্যজনক ভাবে আমরা দেখেছি, তারা মিথ্যাকে বৈধ ও সহজ ভাবতে শুরু করেছে। এমন এমন মিথ্যাচার তাদের কাছ থেকে শুনা যায় যার কোনো ব্যাখ্যা নেই। তারা ওই সমস্ত তাগুতদেরকে বন্ধু বানিয়ে নিয়েছে যাদেরকে তারা এক সময় তাগুত বলতো এবং এ বিষয়ে সাক্ষ্য দিতো।

অপরদিকে তারা মুজাহিদদের সাথে সর্ম্পক ছিন্ন করতে শুরু করেছে। গোপনে তারা যে জিনিসের উৎসাহ দিত প্রকাশ্যে সেগুলোর নিন্দা জ্ঞাপন শুরু করেছে। তাদের প্রাথমিক অবস্থা ছিলো, তাদেরকে একটি ইবাদতের কারণে আটক করা হলো এবং কোনো মামলা ছাড়াই তারা সেখানে গেলেন। আর তাদের শেষ অবস্থা দাঁড়ালো, তারা যে ফরজ কাজগুলো আঞ্জাম দিতো সেগুলোর ব্যাপারে চুপ থাকার অঙ্গীকার নিয়ে বের হলেন। শুধু এটুকুই নয়, বরং বের হওয়ার পর জিহাদ ও মুজাহিদের সাথে শত্রুতা এবং আল্লাহর শরীয়তকে পরিবর্তন করা আরম্ভ করলেন।

সুতরাং কোনো মুজাহিদের বিরুদ্ধে যদি ওয়ারেন্ট জারি হয় সে যেন এ বিষয়গুলো নিয়ে চিন্তা করে। সে গ্রেফতার হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার একটি ফরয বিধান পালনের কারণে। যদি জিহাদ নফলও হতো তাহলেও শাস্তি দেওয়া তো দূরের কথা, শুধু তিরস্কার করাই বড় কুফর হিসেবে বিবেচিত হতো। সুতরাং যখন তা গোটা উম্মাতে মুসলিমার ওপর ফরয ও অবধারিত হয়ে আছে তখন

এটা কীভাবে বৈধ হতে পারে? তাছাড়া শুধু যে ফরয তাও নয়, বরং ফরযে আইন হয়ে আছে। অপরদিকে এ বিধান পালনকারীর সংখ্যাও অত্যন্ত নগন্য। তাহলে এই করুণ পরিস্থিতিতে তাকে এর কারণে শাস্তি দেওয়া কী পর্যায়ের কুফরী হবে?! এতকিছুর পরও সে নির্বিচারে আটক হচ্ছে। আর বিচার হলেও এর কারণে শাস্তির ফায়সালা হচ্ছে।

সুতরাং সে কারাগারে অচিরেই যেসব ফেতনার সম্মুখীন হবে তা নিয়ে যেন একটু চিন্তা করে। স্বয়ং কারাগারটাই একটা ফেতনা। তার ওপর রয়েছে বিভিন্ন প্রলোভন ও হুমকি ধমকির ফেতনা। মুজাহিদ ভাইরা এমন অনেককে দেখেছেন যাদের দ্বীন, মতাদর্শ ও নৈতিকতা কারাগারে যাওয়ার পর বদলে গেছে। এসব পরিবর্তন এমন কোনো দলীলের ভিত্তিতে হয়নি যা তাদের কাছে আগে স্পষ্ট ছিলো না, এখন স্পষ্ট হয়েছে। বা এমন কোনো যুক্তির প্রেক্ষিতে হয়নি যা আগে বুঝতো না, এখন বুঝেছে। বরং তুমি তাকে কোনো ধরনের যুক্তি-প্রমাণ ছাড়াই কথা বলতে দেখবে। তার বক্তব্যের পক্ষে এমন এমন যুক্তি তুলে ধরবে যা সে নিজেও বিশ্বাস করে না। এটা ফেতনা ছাড়া আর কিছুই না। আমরা আল্লাহ তা'আলার কাছে হেদায়াতের ওপর অবিচল থাকার তাওফীক কামনা করি।

আর যখন কোনো মুজাহিদকে তার দ্বীনের ব্যাপারে ফেতনায় ফেলার জন্য গ্রেফতারী পরোয়ানা জারী করা হয় তখন তার ওপর আবশ্যক হল যথা সম্ভব পালিয়ে থাকা ও সাধ্যানুযায়ী আত্মরক্ষা করা। ইমাম বুখারী রহ. তাঁর কিতাবে

بابٌ من الدين الفرار من الفتن

"ফিতনা থেকে পলায়ন করা দ্বীনের অংশ" এই নামে একটি অধ্যায় রচনা করেছেন। সেখানে তিনি একটি হাদীস উল্লেখ করেছেন, "অচিরেই মুসলিমদের সর্বোত্তম সম্পদ হবে বকরী যা নিয়ে সে পাহাড়ের চূড়ায় চলে যাবে।

তোমার চেয়ে উত্তম ব্যক্তিরাও নিজের ব্যাপারে ফিতনার ভয় করেছেন। হযরত ইবরাহীম আ.ও নিজের ব্যাপারে ফিতনার ভয় করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, "হে আমার রব, আমাকে এবং আমার পুত্রকে মূর্তিপূজা থেকে রক্ষা করুন।" সালাফদের একজন বলেছিলেন, 'ইবরাহীম আ.র পর আর কে ফেতনা থেকে নিশ্চিন্ত থাকতে পারে?

সুতরাং পালিয়ে যাও, আত্মগোপন করো। লড়াই করো ও আত্মরক্ষা করো। কোনোক্রমেই বন্দী হয়ো না।

কারাগার কী?

ফেরাউন যখন হযরত মুসা আ. কে হুমকি ধমকি দিচ্ছিলো তখন তার ধমকির মধ্যে এটাও ছিলো,

{لئن اتَّخذت إلهًا غيري لأجعلنَّك من المسجونين}

যদি তুমি আমি ছাড়া অন্য কোনো ইলাহ গ্রহণ করো তাহলে আমি তোমাকে কারাবন্দী করবো।

শুধু কারাগারটাই একটা শাস্তি। তাইতো ফেরাউন হযরত মূসা আ. কে কারাগারের ভয় দেখাচ্ছে। তেমনিভাবে কুরাইশের মুশরিকরা যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছিলো তখন তাদের একটি পরিকল্পনা এও ছিলো যে, তারা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বন্দী করবে।

وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ ۚ .... [٨:٣٠]

"এবং স্মরণ কর যখন কাফেররা বন্দী করা বা হত্যা করা বা বহিস্কার করার ষড়যন্ত্র করছিল" (সূরা আনফাল-৩০)

যেহেতু কারাগার প্রত্যেকের জন্য এই অর্থ বহন করে যে, তা মুসলিমদেরকে তাদের ধর্মীয় কাজ এবং জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ থেকে বাধা প্রদান করে; হ্যাঁ, এতে কোন সন্দেহ নেই যাকে অনিচ্ছায় বন্দী করা হয়েছে সে নিন্দিত হবে না। বরং সে সওয়াবের অধিকারী হবে এবং যে আমল পূর্বে করতো সে অনুযায়ী তার প্রতিদান জারি থাকবে। কথা হচ্ছে তাকে নিয়ে যার জন্য পলায়ন করে কাজ চালিয়ে যাওয়া সম্ভব ছিলো; কিন্তু পলায়ন না করে সে তাগুতের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে; ফলে তাগুতকে নিজের ওপর অত্যাচার করার এবং আল্লাহ তার মাধ্যমে কল্যাণের যে ধারা চালু করেছিলেন তা বন্ধ করার সুযোগ তৈরি করে দিয়েছে।

কারাগার একটি আযাব; আশা করি সকলে তা উপলব্ধি করতে পেরেছেন। কেননা তাতে প্রবেশ করার অর্থ হলো ফিতনায় পতিত হওয়া। সেখানে তাগুতরা ভয়-ভীতি দেখিয়ে বা প্রলোভন দেখিয়ে তার দ্বারা বিভিন্ন কাজ উদ্ধার করতে চাইবে। তাছাড়া দীর্ঘ অনেকগুলো বছর নির্যাতনে পিষ্ট হওয়ার বিষয়টি তো আছেই।

তাই দ্বীন দরদি ব্যক্তির জন্য এবং দ্বীনের ব্যাপারে ভীত ব্যক্তির জন্য উচিত হবে না, সর্বোপরি একজন বিচক্ষণ ব্যক্তির জন্য উচিত হবে না, ছোট বিপদের ভয়ে বড় বিপদে প্রবেশ করা; যেখানে সে নিজেও জানে না তার দ্বীন নিরাপদ থাকবে কি না।

পূর্বে আলোচনা হয়েছে, আত্মসমর্পণের অর্থ হলো কাফেরের অধীনে ও কর্তৃত্বে প্রবেশ করা, তার আইনের কাছে আত্মসমর্পণ করা, পাশাপাশি মু'মিনের ওপর হস্তক্ষেপ করার সুযোগ তৈরি করে দেয়া। আর এ সবগুলো বিষয় বর্তমান সময়ে কারাগারগুলোতে আরও ভালোভাবে হয়ে থাকে। এমনকি তারা ওযু, ইস্তিঞ্জার সময়ও নির্যাতন করে থাকে। তারা এ পরিমাণ কর্তৃত্ব খাটায় যে একজন গৃহকর্তাও তার পরিবারের সদস্যদের ওপর এতটা খাটায় না। বরং অনেক সময় তা গোলামের ওপর মনিবের কর্তৃত্ব থেকেও বেশি হয়ে যায়। তাহলে একজন তাওহীদবাদী কীভাবে তার শত্রুকে নিজের ওপর এমন অধিকার দিতে পারে?!

এতো গেলো কারাগারের স্বাভাবিক চিত্র। কিন্তু যদি সেখানে যুক্ত হয় রিমান্ডের এমন কঠিন নির্যাতন যা পাহাড় পর্যন্ত টলিয়ে দেয় তাহলে অবস্থা কী দাঁড়াবে?

সামনের পরিচ্ছেদে (সউদি আরবের সাবেক স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী) নায়েফ ও তার সাঙ্গপাঙ্গদের কারাগারগুলোতে যে ভয়ংকর শাস্তি দেয়া হয় এর কিছু বিবরণ তুলে ধরবো।

রক্তাক্ত কাহিনী

নায়েফ বিন আব্দুল আযীয- যাকী বদরের সহযোগিতা চাইবে এতে আশ্চর্যের কিছু নেই (আল্লাহ তাদের উভয়ের সাথে উপযুক্ত ব্যবহার করুন)। যাকী বদর মিসরের সাবেক স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী। বর্তমান সময়ে অত্যন্ত পারদর্শী এক নিপীড়ন নেতা, নিপীড়নের বিভিন্ন কলা-কৌশল যার মাথা থেকে বের হয়। তারা উভয়ে আদর্শিক দিক থেকে ও মুসলমানদের সাথে শত্রুতার দিক থেকে একে অপরের ভাই। এটা যেমন আশ্চর্যের বিষয় নয় তদ্রুপ এটাও আশ্চর্যের নয় যে, নায়েফ যাকী ছাড়াও আরো অন্যান্য অভিশপ্তদের পথ অনুসরণ করবে। মুজাহিদদেরকে শাস্তি দেয়ার ক্ষেত্রে এবং সাজানো ঘটনা তৈরি করার ক্ষেত্রে সে এমন ভাবে ওই অভিশপ্তদের অনুসরণ করে যেমন পায়ের দুটি জুতা একটি অপরটির অনুসরণ করে।

হারামাইনের দেশে সাম্রাজ্যবাদী তাগুতের জিন্দান খানায় কপালকে ঘর্মাক্তকারী নির্যাতনের কাহিনী প্রচুর। এখানে আমরা শুধু উপদেশ হিসেবে কিছু ঘটনা উল্লেখ করবো। অধিকাংশ মুজাহিদ যুবক হয়তো নিজেই এই শাস্তি ভোগ করেছে বা যারা ভোগ করেছে তাদের সাক্ষাত পেয়েছে এবং তাদের কাছ থেকে নির্যাতনের এ সব কাহিনী শুনেছে। উদাহরণস্বরূপ এখানে মাত্র তিনটি ঘটনা উল্লেখ করবো। যেগুলো ঘটেছিলো তিনটি মামলায় তিনটি ভিন্ন ভিন্ন কারাগারে।

প্রথম ঘটনাটি ঘটেছিলো উলয়ার বিস্ফোরণ মামলায় রুবাইছ কারাগারে। দ্বিতীয়টি খুবারের বিস্ফোরণ মামলায় দাম্মাম কারাগারে। তৃতীয়টি ফিনীলের বিস্ফোরণ মামলায় আলিসার কারাগারে। প্রতিটি ঘটনাই নির্ভরযোগ্য সূত্রে জেনেছি এবং এর সত্যতার ব্যাপারে নিশ্চিত হয়েছি।

নির্যাতনের সবচেয়ে বড় ঘাঁটিগুলোর একটি হলো, ইহুদি তদন্ত বিভাগ, যার নাম রুবাইছ কারাগার। যার পরিচালক ছিলো বিগ্রেডিয়ার যাকযুক। (পরাক্রমশালী আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি তিনি যেন তাকে সবচেয়ে কঠিন শাস্তি দেন)

রুবাইছ কারাগার; বিশ্বজুড়ে এর কুখ্যাতি রয়েছে। ক্রুসেডারদের তদন্ত বিভাগ, সিরিয়ায় নুসাইরিদের কারাগারগুলো যেমন তাদাম্মুর কারাগার, মিসরের কারাগারগুলো যেমন আবু যা'বাল- এগুলোর সাথে রুবাইছ কারাগারকে তুলনা করা যেতে পারে। বরং এর কুখ্যাতি এগুলোকেও ছাড়িয়ে গেছে। একবার অষ্ট্রেলিয়ার তদন্তকারী একটি দল তাদের দেশের কিছু লোককে জিজ্ঞাসাবাদের সময় এ কথা বলে শাসিয়েছিলো যে, যদি তারা মুখ না খুলে তাদেরকে রুবাইছ কারাগারে প্রেরণ করা হবে!!

শায়খ আবুল লাইস আল লিবী ও তার সাথীবর্গ রুবাইছ কারাগারে তাদের ওপর করা নির্যাতনের যে চিত্র বর্ণনা করেছেন তা হয়তো আমরা সকলেই পড়েছি বা শুনেছি। পরবর্তীতে অবশ্য আল্লাহ তা'আলা তাদের জন্য সেখান থেকে পলায়নের ও মুক্তির ব্যবস্থা করে দিয়েছেন।

রিয়াদে বোমা বিস্ফোরণের পর এধরনের অনেক ঘটনা আরও অনেক যুবকের সাথে ঘটেছে। তখন প্রায় ৫০০ মুজাহিদকে রুবাইছ কারাগারে বন্দি করা হয়। তাদের সবাইকে স্বীকারোক্তি দেয়ার জন্য নির্যাতন করা হয়েছিল, অথচ তারা এ ঘটনার সাথে জড়িত ছিলেন না। তখন তাদের সাথে কী যে ঘটেছিল তা একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই জানেন।

এক ভাইয়ের কাহিনী

তাঁদের একজন তার কাহিনী বর্ণনা করেছেন। বলেছেন, একবার আমাকে এত বেশি চাবুকাঘাত করা হয়েছিল যে আমার দেহ রক্তাক্ত হয়ে যায়। পোকামাকড়ে ভরা একটি নোংরা রুমে আমাকে রাখা হয়। আমার তাজা জখমের ওপর পোকমাকড়গুলো যখন উড়ে এসে পড়তো তখন ছুরির আঘাতের চেয়েও বেশি যন্ত্রনা দিতো। তখন আমি একদমই বেঁচে থাকতে চাচ্ছিলাম না। তারা আমাকে শাস্তি দেওয়ার জন্য পিছনের রাস্তা দিয়ে জ্বলন্ত সিগারেট ঢুকিয়ে দিতো। এটা আমাকে এত যন্ত্রনা দিতো যা ভাষায় প্রকাশ করা যাবে না। এই সিগারেটের আঘাত সবচেয়ে বেশি কষ্ট দিত যখন টয়লেটে যেতাম। তখন মনে হত আমার মস্তক ফুটানো হচ্ছে এবং আমার মস্তক এখনই বিস্ফোরিত হবে। কখনো মনে হতো, আমি হয়তো মারাই যাচ্ছি। কিন্তু –শত আফসোস- পরক্ষণেই বুঝতাম যে আমি জীবিত আছি।

অতঃপর আমি স্থির করলাম, তারা যে স্বীকারোক্তি চাচ্ছে তা দিয়ে দিবো। কারণ রিয়াদ বিস্ফোরণের ঘটনায় স্বীকারোক্তি নেয়াই ওদের উদ্দেশ্য। সে হিসেবে আমি স্বীকারোক্তি দিলাম। আল্লাহ কসম! তখন আমার আকাঙ্খা ছিলো তারা যেন আমাকে শেষ করে দেয়। এরপর তারা অনুসন্ধান শুরু করলো। অনুসন্ধানে খুব সহজেই বের হয়ে আসলো আমার স্বীকারোক্তি মিথ্যা ছিলো। কারণ, আমি ঘটনার বিবরণ কিছুই জানি না। এরপর তারা আমাকে আবার শাস্তি দিতে শুরু করলো।

এখন প্রশ্ন হলো- ওই ইহুদিরা তার কাছ থেকে কী চায়? স্বীকারোক্তি? তাতো সে দিয়েছে। নাকি তাকে হত্যা করতে চায়? অথচ সে বলছে আমাকে হত্যা করো, আমাকে নিস্তার দাও, তোমরা যা চাও তার স্বীকারোক্তি আমি দেবো।

এরপর সে কী করলো? ভেতরের এক বন্দী তার অবস্থার ওপর সদয় হয়ে তাকে পরামর্শ দিলো, তুমি আত্মহত্যার চেষ্টা করছো এমন একটা ভাব দেখাও। এটা করলে কারা কর্তৃপক্ষ শাস্তি বন্ধ করে দিবে। এরপর সে অপেক্ষায় রইলো। একবার যখন বুঝলো যে, এক সৈন্য তার কাছাকাছি তখন সে নিজেকে একটি রশির সাথে ঝুলিয়ে দিল; বুঝাচ্ছিল, সে গলায় ফাঁস দিচ্ছে। এটা দেখে তারা দৌড়ে আসল এবং ফাঁসি থেকে তাকে মুক্ত করল। এরপর তারা তাকে কারা প্রধান যাকযুকের কাছে নিয়ে গেল। তখন আল্লাহর শত্রু তাকে কী বলেছিল? এই খবীস তাকে ওয়াজ করছিলো- তুমি কীভাবে আত্মহত্যা করছো, অথচ তুমি কি ওই হাদীস জানো না, "আমার যে বান্দা নিজে নিজেই আমার কাছে চলে আসে আমি তার জন্য জান্নাতকে হারাম করে দেই?!!

তোমরা কি নছিহতকারী এই শিয়ালের কথা শুনেছো?! এই ইহুদির ধার্মিকতা লক্ষ্য করেছো? আল্লাহ তা'আলা আত্মহত্যা হারাম করেছেন এটা সে জানে, দলিলও মুখস্থ; কিন্তু বন্দীদের প্রতি সীমালঙ্ঘন করা, মুজাহিদদেরকে নির্যাতন করা, তাদের লজ্জাস্থান উন্মুক্ত করা এবং আল্লাহকে গালি দেয়া- এগুলোও যে হারাম করেছেন তা সে জানে না।

এটা কোনো পৌরাণিক কাহিনী নয়, বরং আল্লাহর শপথ! এগুলো রুবাইছ কারাগারে প্রসিদ্ধ মুজাহিদীনের ওপর নির্যাতনের কিছু চিত্র।

শায়েখ ইউসুফ আল উয়াইরী রহ.র কাহিনী

শায়েখ শহীদ ইউসুফ আল উয়াইরী রহ.কে (আল্লাহ তাকে শহীদ হিসেবে কবুল করুন) খুবার বিস্ফোরণের পর গ্রেফতার করা হয়েছিল। তাকে প্রায় তিন বছর আটক রাখা হয় এবং ভয়ংকর শাস্তি দেয়া হয়। অভিযোগ, তিনিই সে বোমার বিস্ফোরণ ঘটিয়েছেন। অথচ আল্লাহর শপথ তিনি এ সম্পর্কে কিছুই জানতেন না। তিনি পরিচালনা করবেন তো দূরের কথা, জানতেনও না, কারা ওটা করেছে। এত প্রচন্ড টর্চার হতো যে তাকে বহন করে সেলে ফিরিয়ে আনতে হতো। পায়ে হাঁটার মতো শক্তি থাকতো না। নির্যাতনের কারণে তার হাত ভেঙ্গে গিয়েছিল। অতঃপর তিনি স্বীকারোক্তি দেয়ার জন্য সম্মতি প্রদান করলেন এবং কারা পরিচালকের সাথে সাক্ষাত করতে চাইলেন। যখন তার কাছে তাকে নিয়ে যাওয়া হল, তিনি বললেন, আমি জানি, তোমরা হামলাকারীকে সনাক্ত করতে পারছো না বিধায় সমস্যায় আছো। আমার কোন বাধা নেই, তোমরা যা চাও তার স্বীকারোক্তি প্রদান করবো। তখন কারা পরিচালক রেগে গেল এবং তাকে সেলে ফিরিয়ে নিতে নির্দেশ দিলো। তিনিও আগের ব্যক্তির মতোই বললেন, আমিই বিস্ফোরণ ঘটিয়েছি সুতরাং আমাকে হত্যা করো এবং এ অসহনীয় শাস্তি থেকে নিস্তার দাও।

রিয়াদ বিস্ফোরণে সন্দেহভাজনদের ওপর হায়ের, আলীশা ও অন্যান্য কারাগারে যে ধরণের নির্যাতন করা হয়েছে, এর মাধ্যমে তারা তাদের স্বাভাবিক নীতিবিরুদ্ধ কাজ করেছে। কেননা আলীশা কারাগারের ব্যাপারে নীতি ছিলো সেখানে ছোট মামলার আসামীদের রাখা হবে এবং সেখানে কোনো নির্যাতন হবে না।

মুহাম্মদ আল-মুবাররাযের কাহিনী

বর্তমানে সেখানে যাদেরকে নির্যাতন করা হচ্ছে তাদের একজন হলেন মুহাম্মদ আল-মুবাররায। যাকে একদল তদন্তকারী পুলিশ অফিসার নির্যাতন করতো। একদিন সাতজন অফিসার তাকে নির্যাতন করার জন্য একত্রিত হয়েছিল। প্রত্যেকের হাতে ছিল একটি করে মোটা লাঠি। তারা কোনো ধরণের নমনীয়তা ছাড়া তাকে আঘাত করতে শুরু করল। মুশরিকদের ব্যাপারে যেমনটা কোরআনে আল্লাহ তাআলা বলেছেন: "তারা তোমাদের ব্যাপারে না আত্মীয়তার পরোয়া করে, না কোনো চুক্তির"। ঠিক একই ধরণের নির্যাতন তারা করে যাচ্ছিলো; দয়া-মায়ার লেশমাত্র ছিলো না। কিছুক্ষণ পর এক অফিসার সেখান থেকে বের হয়ে আসে, লাঠি দিয়ে আঘাত করতে করতে তার হাত রক্তাক্ত হয়ে গেছে। প্রহারকারীর অবস্থা যখন এই, তখন বন্দীর অবস্থা কেমন হবে?! সে তার হাত ধৌত করতে গেল, তারপর ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধে তার সফরকে পূর্ণ করতে আবার ফিরে আসলো। যেন পোপ ফাহাদ তার কানে চিৎকার করে উৎসাহ দিয়ে যাচ্ছে- চালাতে থাকো, অবশ্যই ক্রুশ তোমাদের বরকত দিবে।

আরেক মুজাহিদ ভাই, নাম সালেহ আল যুদাইয়ী। তার পরিবার তাকে দেখতে গেলে সে তাদের সামনে রক্ত মাখা কাপড় বের করলো। তার ওপর নির্যাতনের জন্য বৈদ্যুতিক চেয়ার ছাড়াও আরও বিভিন্ন মেশিন ওরা ব্যবহার করতো। ফলে তার এ অবস্থা হয়েছিলো।

কারাগারে তারা কি ধরণের নির্যাতনের শিকার হয় এ সংক্রান্ত মেশিনগুলো দেখলে কিছুটা আঁচ করা যাবে। নির্যাতনের জন্য নব আবিস্কৃত বিভিন্ন মেশিন ব্যবহার করা হয়। যেমন বৈদ্যুতিক চেয়ার, বড় বড় পেরেক যেগুলো হ্যান্ডেল ঘুরিয়ে ধীরে ধীরে নিচ থেকে উপরের দিকে উঠানো হয়। কঠিন নির্যাতনের জন্য বন্দীর পিছনের রাস্তা দিয়ে তা প্রবেশ করানো হয়। এমন এমন বিষয় যেগুলো শুধু আলোচনা করতে গেলেই একজন সভ্য মানুষের অন্তর চুপসে যাবে। সুতরাং বাস্তবে যারা এর শিকার তাদের অবস্থা কী?! আর চামড়ার চাবুক, কাঠের লাঠি ও লোহার বিভিন্ন যন্ত্র- এগুলো কারাগারের সর্বত্র পাওয়া যেতো। সেখানে সবচেয়ে বেশি যে অপরাধটি সংঘটিত হচ্ছে তা হলো- ধর্মের সাথে নায়েফের অবিরাম বিশ্বাসঘাতকতা ও কাফের মুশরিকদের সাথে তার সখ্যতা। সুতরাং আল্লাহর অভিশম্পাত তাদের ওপর যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসের প্রতি বিশ্বাস রাখে না; আমেরিকাকে রব মানে, নোংরামীকে দ্বীন মানে এবং নায়েফকে তাদের রব আমেরিকার পক্ষ থেকে নবী ও রসূল মানে।

জুহাইমান উতাইবীর এক সঙ্গীর কাহিনী

১৯৭৯ সনে জুহাইমান উতাইবীর ঘটনার পর থেকে কারাগারে নির্যাতনের চিত্র এতটা ভয়াবহ হয়েছে যা বর্ণনা করার মতো নয়। তখন থেকে ধীরে ধীরে রুবাইছ কারাগার নির্যাতনের এক কসাই খানায় পরিণত হয়েছে।

জুহাইমান যখন (আক্রমণের উদ্দেশ্যে) হারামে প্রবেশ করে তখন শেষ মুহূর্তে তার কিছু সহচর তার সঙ্গ ত্যাগ করে। সেই দলছুট সদস্যদেরই একজন আমাকে বলেছে, তাদের অধিকাংশই জুহাইমানের সাথে থাকা মাহদীকে বিশ্বাস করতো না। কিন্তু যখন তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হলো- তাহলে জুহাইমানের সঙ্গ দিচ্ছ কেন? তখন তারা উত্তরে বললো, পরিস্থিতি যে পর্যায়ে গড়িয়েছে সে হিসেবে কারাগারে যাওয়ার চেয়ে জুহাইমানের সঙ্গে থাকা ভালো। কারণ, আমাদের যেসব ভাই ইতিপূর্বে গ্রেফতার হয়েছেন তাদের পরিণতি এতটাই কঠিন হয়েছিলো যে, নির্যাতনের কারণে তারা মানসিকভাবে বিকারগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলো। আবার কেউ কেউ তো একেবারে লাপাত্তা হয়ে গেছে।

ফলে হারামের বাহিরে থাকলে কঠিন নির্যাতনের শিকার হতে হবে এ কথা চিন্তা করে অনেকেই (হারামের ভেতরে) জুহাইমানের সঙ্গ গ্রহণ করে। অস্ত্রসহ যখন তারা হারামে প্রবেশ করে তখন এই ব্যাখ্যা তাদের মাথায় ছিলো যে, তারা বাইতুল্লাহর ছায়াতলে আল্লাহর আশ্রয় অবলম্বন করছে। জুহাইমানের সঙ্গীদের এ অংশটি সেসব শাসকবর্গকে কাফেরও বলতো না। তাই সেখানে প্রবেশকালে কাফেরদের মোকাবেলা এটাও তাদের উদ্দেশ্য ছিলো না। শুধুই বাইতুল্লাহর আশ্রয় গ্রহণ তাদের উদ্দেশ্য ছিলো। আর বাইতুল্লাহর আশ্রয় গ্রহণ করা বৈধ। বাকি রইলো, হারামের ভেতরে অস্ত্র বহন করার বিষয়টি। সেক্ষেত্রে তাদের ব্যাখ্যা ছিলো- কেউ যদি নিজ জীবনের ব্যাপারে শংকিত হয় তার জন্য অস্ত্র বহন করা জায়েয, যেমনিভাবে মক্কা বিজয়ের সময় রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবাদের নিয়ে হারামে প্রবেশ করেছেন আর তাদের সাথে কোষবদ্ধ তরবারি ছিলো।

তাঁরা কারা?

তাঁরা হচ্ছেন এমন ব্যক্তিবর্গ যারা পবিত্রতম শহরে গুরুতর শাস্তি ভোগ করছেন, তাওহীদের ভূমিতে তাওহীদের জন্য শাস্তি পাচ্ছেন, জিহাদের ভূমিতে জিহাদের জন্য নির্যাতিত হচ্ছেন। তাঁরাই হচ্ছেন প্রকৃত বীর, শরীয়তের অতন্দ্র প্রহরী, দ্বীনের রক্ষক।

মুসলিম উম্মাহর সম্মান ও মর্যাদার হেফাযতকারী। দেশ ও জাতির প্রতিরক্ষাকারী। তাঁরা ঐ সকল ব্যক্তি যারা মুসলিম ভাইদের জন্য নিজেদের জীবন কুরবানী করেছেন।

যাদের ওপর এই শাস্তি প্রয়োগ করা হচ্ছে তাঁরা এমন ব্যক্তিত্ব, ইসলামের সর্বোচ্চ চূড়ায় যারা আরোহন করেছেন এবং ইসলামের ভিত্তিসমূহকে সজীব রেখেছেন। তাঁরাই হলেন মানুষের মধ্যে সর্বোত্তম এবং মানবজাতির জন্য সর্বাধিক উপকারী।

মুসলিম উম্মাহর কর্তব্য, তাঁদেরকে যথাযথ সম্মান ও মর্যাদা দেয়া, দ্বীনের জন্য তাঁদের কুরবানি এবং তাঁদের যথাযথ মর্যাদা উপলব্ধি করা।

এ বিষয়টি যদি দ্বীনী বিষয় নাও হতো তবুও তো বীরত্ব ও সাহসিকতাকে প্রত্যেক জাতিই সম্মান করে থাকে। প্রত্যেক জাতিই তাদের বীরদেরকে মর্যাদা দিয়ে থাকে এবং পরম শ্রদ্ধার সাথে তাঁদেরকে স্মরণ করে।

ইসলামের বীর বাহাদুর

আজ যদি তাঁরা না থাকতেন তাহলে কারা আমাদের ইতিহাসের সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ হিসাবে গণ্য হতো? ধোকাবাজ, নীচ, অথর্ব মুরতাদ শাসকগোষ্ঠী?

নাকি চাটুকার, সত্য গোপনকারী, হক্ককে বাতিলের সাথে মিশ্রণকারী ওলামাগণ? যারা বেশ আয়েশি ভাবেই জীবনযাপন করছেন। তারা সৌজন্যতা দেখাতে অথবা ভয়ে নিশ্চুপ থাকেন এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদেরকে যে আদেশ দেয়া হয়েছে তা অপারগতার অজুহাত দেখিয়ে পরিত্যাগ করেন। কাজেই তাদের অস্তিত্ব থাকা না থাকা সমান।

নাকি অন্যান্য এমন সব আবর্জনারা সম্মানিত হিসাবে গণ্য হত যারা বানের পানিতে ভেসে যাওয়া খরকুটোর মতো?

তাঁরা হচ্ছেন খালেদ বিন ওয়ালীদ, সালাহউদ্দীন আইয়্যুবী, শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়াহ ও মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওয়াহহাব রহ. এর উত্তরসূরী। তবে তাঁদের অপরাধ (?) হল, তাঁদের পূর্বসূরীরা ইসলামের বড় বড় বীর ছিলেন আর তখন ছিল মুসলিম শাসকদের যুগ। আর তাঁরাও ইসলামের বড় বড় বীর তবে তাঁদের যুগটা হল ধোকাবাজ শাসকদের।

আর আমরা এমনটাই মনে করি যে, বীর কমান্ডার খাত্তাব রহ. গ্রেফতার হলে রুশরা তাঁর সাথে যে আচরণ করতো এই তাগুতরা এ সকল ব্যক্তিবর্গের সাথে এমন আচরণই করে। ইসলামী সেনাবাহিনীর সেনাপতি শাইখ উসামা বিন লাদেন রহ. যদি আমেরিকার হাতে গ্রেফতার হতেন তাহলে তাঁর সাথে আমেরিকার আচরণ সম্পর্কে আমরা কি ধারণা করতে পারি? হক ও বাতিল, হেদায়েত ও গোমরাহী, ঈমান ও কুফর যতদিন থাকবে ততদিন এ যুদ্ধ চলমান থাকবে।

এ সবকিছু এমন সময়ের ঘটনা যখন দ্বীন, দ্বীনের সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তিবর্গ এবং দ্বীনের মুজাহিদীন সম্পর্কে ঠাট্টা-বিদ্রুপ শুনতে হয়। মিডিয়ায় আল্লাহ তা'আলার আয়াত, তাঁর কিতাব এবং দ্বীনের মৌলিক বিষয়গুলো নিয়ে বিদ্রুপ করতে শোনা যায়। তুর্কী আল-হামাদ'রা বলে বেড়ায়, "আল্লাহ এবং শয়তান একই কাজের দু'টি দিক" আল্লাহ তাকে এবং তার পক্ষাবলম্বনকারী, সুরক্ষাদানকারী এবং আশ্রয়দাতাকেও ধ্বংস করুন। এটি এমন সময়ের অবস্থা যখন বড় বড় ধর্মনিরপেক্ষ নেতা এবং পথভ্রষ্টদের প্রধানকে রাষ্ট্রের শাসক হিসাবে নির্ধারণ করা হয়। দ্বীনের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারী এবং মুমিনদের বিপক্ষে যুদ্ধকারী ধর্মনিরপেক্ষ নাস্তিকদেরকে মন্ত্রী পরিষদের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়।

সুতরাং, আমরা আল্লাহর কাছে দোয়া করি, তিনি যেন নির্যাতিতদের প্রতি দয়া করেন, বন্দীদেরকে মুক্তি দান করেন। তাগুতদেরকে ধ্বংস ও অপদস্থ করেন এবং তাদের পরাজয় তরান্বিত করেন।

সত্বর তাদের রাজত্ব দূরীভূত হোক

বোঝা বেশি ভারি হয়ে গেছে

তাঁদের ব্যাপারে আমাদের কর্তব্য

আমি এতক্ষণ যা বলেছি তা অন্তরকে দুর্বল করার জন্য বলিনি। বরং এ জন্যই বলেছি, যেন একজন মুত্তাকী, বীর মুজাহিদ এবং স্বাধীন ব্যক্তি নিজের ওপর থেকে বন্দিত্বকে প্রতিহত করে যেন এর মাধ্যমে অন্যদের পক্ষ থেকেও প্রতিহত হয়ে যায় এবং সে যেন অন্যান্য বন্দিদেরকেও বন্দীদশা থেকে মুক্ত করতে আগ্রহী হয়ে ওঠে।

পক্ষান্তরে নারীসুলভ দুর্বল সংকল্পের অধিকারী নিকৃষ্ট অন্তর, ভীরু, কাপুরুষ ও আতঙ্কিত ব্যক্তিরা এসবের ভেতরে নিজের জন্য প্রবঞ্চনা খুঁজে পাবে। তাগুত ও তার পুলিশবাহিনী কর্তৃক গ্রেফতারি এবং অত্যাচার-নির্যাতনের অজুহাত দেখিয়ে তাঁর ওপর অর্পিত ফরজ থেকে সরে যাবার প্রয়াস পাবে। তারপর এ কারনে আল্লাহর হুকুম থেকে পলায়ন করবে। আর এমন ব্যক্তিদের মতো কাজ করবে যাদের সম্পর্কে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেছেন-

لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأً أَوْ مَغَارَاتٍ أَوْ مُدَّخَلًا لَّوَلَّوْا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ [٩:٥٧]

"তারা কোন আশ্রয়স্থল, কোন গুহা বা মাথা গোঁজার ঠাই পেলে সেদিকে পলায়ন করবে দ্রুতগতিতে"। (সূরা তাওবাঃ-৫৭)

যারা শরিয়ত পালনের ব্যাপারে দৃঢ় এবং যাদের অন্তর মানব-রচিত আইন কানুন থেকে পবিত্র পূর্বোক্ত আলোচনা তাঁদের সামনে দু'টি বিষয়কে সুস্পষ্ট করবে,

এক.

কোনো অবস্থাতেই আত্মসমর্পণ না করা বরং প্রস্তুতি গ্রহণ করা ও পরিকল্পনা প্রণয়ন করা। শত্রুদেরকে প্রতিহত করা এবং তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তাদেরকে বিতাড়িত করতে থাকা অথবা আল্লাহর রাস্তায় শাহাদাত লাভ করে ধন্য হওয়া।

দুই.

বন্দীদেরকে মুক্ত করতে সচেষ্ট হওয়া এবং এক্ষেত্রে কালিমুল্লাহ হযরত মুসা আ. র অনুসরণ করা। আল্লাহ তা'আলা যখন তাঁকে ফেরাউনের কাছে পাঠালেন তখন তিনি ফেরাউনকে লক্ষ্য করে বললেন-

فَأْتِيَاهُ فَقُولَا إِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ ۖ ... [٢٠:٤٧]

"অতএব বনী ইসরাঈলকে আমাদের সাথে যেতে দাও এবং তাদেরকে নির্যাতন করো না"। (সূরা ত্বাহা-৪৭)

এখানে দু'টি বিষয়ঃ এক. তাদেরকে মুক্তি দেয়া এবং হযরত মুসা আ. র সাথে যেতে দেয়া। দুই. তাঁদের ওপর থেকে শাস্তি প্রত্যাহার করে নেয়া।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা (হযরত মুসা আ.র মাধ্যমে) দীর্ঘ দিনের অপমান, শাস্তি, নির্যাতন ও বিরাট পরীক্ষার পর বনী ইসরাঈলকে নিষ্কৃতি দান করেন।

বর্তনাম যুগের ফেরাউন নায়েফ বিন আব্দুল আজিজ ও তার সাঙ্গপাঙ্গ এবং মিসর, শাম, ইয়েমেন, পাকিস্তান ও পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চলের ফেরাউনদের হাতে আমাদের ভাইয়েরা যে সব শাস্তি ভোগ করছেন কুরআনে কারীমে বর্ণিত ফেরাউনের হুমকি-ধমকি ও শাস্তি এর চেয়ে বহুলাংশে কম ছিল।

আমরা জানি যে, ফেরাউনের সর্বোচ্চ শাস্তি ছিল, 'সে বনী ইসরাঈলদের ছেলে সন্তানদেরকে জবাই করে ফেলত আর মেয়ে সন্তানদেরকে জীবিত রেখে দিত। আর তার সর্বোচ্চ হুমকি ছিল, সে যাদুকরদেরকে বলেছিল, তোদের হাত-পা কোণাকোণি করে কেটে দিবো এবং খেজুর গাছে শূলিতে চড়াবো'।

বর্তমান যুগের ফেরাউনদের দ্বারা ছেলে সন্তানদের হত্যা তো অহরহই হচ্ছে। যেমন জাজিরাতুল আরবের ফেরাউনরা তা করছে। এক্ষেত্রে এখানকার সকল ফেরাউনরা একে অপরকে সহযোগিতা করছে। এমনিভাবে পূর্বের ফেরাউনের চেয়ে নিকৃষ্ট পন্থায় নারীদেরকে জীবিত রাখা হচ্ছে। যেমন, স্বামীর সামনে স্ত্রীর সম্ভ্রম নষ্ট করা হচ্ছে, ছেলের সামনে মায়ের সম্ভ্রম নষ্ট করা হচ্ছ। এসব ঘটনা শামে ঘটেছে, মিসরে ঘটেছে। অন্যান্য দেশেও ঘটেছে এবং সউদি নাগরিকত্ব নেই এমন অনেকের সাথে হারামাইনের দেশেও ঘটেছে। আর এমন সব পদ্ধতিতে শাস্তি প্রদান করা হয়েছে যা হয়তো ফেরাউনের কল্পনাতেও আসেনি, হামানও তাকে এমন সহযোগিতার কথা ভাবতে পারেনি।

বন্দী ও নির্যাতিতদেরকে মুক্ত করা

বন্দী ও নির্যাতিতদেরকে মুক্ত করা জিহাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আপনি লক্ষ্য করুন, হযরত মুসা আ. আল্লাহর দুশমন ফেরাউনকে প্রথমে এ কথাটিই বলেছিলেন?

অন্যত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ইরশাদ করেন-

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا [٤:٧٥]

"আর তোমাদের কী হল যে, তোমরা আল্লাহর পথে লড়াই করছো না, সে সব দুর্বল পুরুষ, নারী ও শিশুদের পক্ষে, যারা বলে, হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদেরকে এই জনপদ থেকে নিষ্কৃতি দান করুন; এখানকার অধিবাসীরা অত্যাচারী। আর আপনার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য পক্ষালম্বনকারী নির্ধারণ করে দিন এবং আপনার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য সাহায্যকারী নির্ধারণ করে দিন" (সূরা নিসাঃ ৭৫)

শপথ করে বলছি, তাদের থেকে জুলুম প্রতিহত করা এবং তাদেরকে মুক্ত করা যদি শরীয়তে ওয়াজিব নাও হত তবুও সুস্থ বিবেক ও মানবতার দাবী এটাই হত। তাঁদের ওপর যা ঘটছে এ ব্যাপারে উদাসীনতা ও অমনযোগিতার কারণ কী? অন্তরের মৃত্যু এবং ইসলামী ভ্রাতৃত্ববোধের অস্তিত্বহীনতাই এর একমাত্র কারণ। অন্যথায় যে ব্যক্তি নিজের জন্য যা ভালোবাসে ভাইয়ের জন্য তা-ই ভালোবাসে সে কি এ থেকে বিরত থাকতে পারে?

যখন একজন মহিলা শুধুমাত্র একটি বিড়াল বন্দী করে রাখার কারণে জাহান্নামী হতে পারে আর এ বিষয়ের গুরুত্ব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে জানিয়ে দিতে পারেন তাহলে আল্লাহ তা'আলার সে সব নেক বান্দাদের হুকুম কি হবে যাদেরকে ওই বিড়ালের চেয়েও নিকৃষ্টভাবে বন্দী করে রাখা হয়েছে? যাদের সাথে এমন জঘন্য আচরণ করা হচ্ছে যে, যারা বাস্তবতা জানে না তারা সেই শাস্তির জঘন্যতা ও বর্বরতার কথা শুনে বিশ্বাসই করে না। শ্রোতার কাছেই যদি এত জঘন্য ও ভয়াবহ মনে হয় তাহলে যাদের ওপর ওসব নির্যাতন চলছে তাঁদের অবস্থা যে কী হবে, তা একবার ভেবে দেখুন!

আল্লাহর কাছে দু'আ করি, তিনি যেন তাদের প্রতি অনুগ্রহ করেন এবং তাঁদেরকে বন্দীদশা থেকে মুক্তি দান করেন।

তাদেরকে হত্যা করতে দ্বিধা করবেন না

ওহে মুজাহিদ ভাই, নিঃসন্দেহে একজন মুমিন সর্বদা মুসলমানের রক্ত প্রবাহিত করা থেকে বিরত থাকবে।

আর এতেও সন্দেহ নেই যে, কাফেরদের প্রধান ও নেতাদেরকে হত্যা করা তোমার নিকট তাদের গোলাম বা গোলামের গোলামদেরকে হত্যা করার চেয়ে বেশি প্রিয়।

কিন্তু নিষ্প্রাণ খোদাভীরুতা হচ্ছে তাগুতের সৈনিকদের সাথে প্রতিরোধ যুদ্ধ করতে দ্বিধা করা। অথচ ছিনতাইকারী যদি কারো সম্পদ নিয়ে যেতে চায় তাহলে তার কাছে সম্পদ তুলে দিতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেন। প্রয়োজনে যুদ্ধ করতে চাইলে যুদ্ধও করতে বলেছেন।

সুতরাং কেউ যদি এর চেয়ে মূল্যবান কিছু হাতিয়ে নিতে চায় তবে তার সাথে কিরূপ আচরণ করা দরকার? যে একাধারে আপনাকে গ্রেফতার করে কারাগারে বন্দী করে শাস্তি দিতে চায় এবং আপনার সাহায্যে মুজাহিদগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করতে চায়। আপনি যেখানে নিক্ষিপ্ত হয়েছেন আপনার ভাইকেও সেখানে নিক্ষিপ্ত করতে চায় তার সাথে কিরূপ আচরণ করা উচিৎ?

এখানে বিষয়টা যদি শুধুমাত্র নিজের (ব্যক্তির) আত্মরক্ষার ব্যাপার হত, তাহলে এটি শরয়ী দলিলের ভিত্তিতে আপনার জন্য বৈধ হত। কিন্তু এর সাথে যেহেতু আরও একটি বিষয় যুক্ত হয়েছে আর তা হচ্ছে, তারা আপনার বিরুদ্ধে আমেরিকাকে সহায়তা করে। আর আমেরিকাই আপনার নাম অথবা গুণাগুণ বর্ণনা দিয়ে আপনাকে চাচ্ছে। তাহলে এমন অবস্থায় হুকুম কী হওয়া উচিৎ?

আমেরিকান সৈন্য যে দেশেরই হোক না কেন এবং যতই নিজেদেরকে ধর্মের সাথে সম্পৃক্ততার দাবী করুক, তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আপনি কি দ্বিধা করবেন? আল্লাহ তা'আলার দ্বীনে আমেরিকান অথবা সৌদি নাগরিকত্বের মাঝে কি কোনো পার্থক্য রয়েছে?

আহলে ইলমগণ যুদ্ধের বিধানের ক্ষেত্রে মূল পক্ষ ও তাদের প্রতিনিধির মাঝে কোনো পার্থক্য করেননি। নিজের জান, মাল, ইজ্জত-আবরু ও দ্বীনের প্রতিরক্ষার জন্য লড়াই করা বৈধ হওয়ার ক্ষেত্রে সরাসরি কোনো কাফের বা কাফের কর্তৃক প্রেরিত মুসলিম দাবিদার লোকদের মধ্যে ফুকাহাগণের বক্তব্যে কোনো মতপার্থক্য দেখা যায়না।

আমেরিকা আপনার ওপর যে সরকার চাপিয়ে দিয়েছে সেটাকে কী করে মুসলিম সরকার বলে ধরে নেয়া সম্ভব? অথচ এরাই হচ্ছে বিশ্বের সর্ববৃহৎ মুরতাদ সরকার, যা গোমরাহী ও বিভ্রান্তি ছড়ানোর ক্ষেত্রে অন্যান্য রাষ্ট্রের চেয়ে কয়েকধাপ এগিয়ে।

তাদেরকে কীভাবে মুসলিম রাষ্ট্রপ্রধান মনে করা সম্ভব? অথচ তাদের রিদ্দাহ (ধর্মত্যাগ) ও কুফুরির কিছু নিদর্শন তো এমন যে, আপনি আল্লাহ তা'আলার আনুগত্য ও তাঁর আদেশ পালন করার কারণে তারা আপনাকে গ্রেফতার করার জন্য খুঁজে বেড়ায়, আপনাকে অনুসরণ করে, ধাওয়া করে, আপনার নিন্দা করে এবং আপনাকে গালি দেয়। আর কাফেরদের গোলামী, ক্রুসেডারদের সহায়তা এবং দ্বীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতেই তারা এসব করে থাকে।

মুসায়লামা কাজ্জাবও এ সব মুরতাদ শাসকদের চেয়ে উত্তম এবং ইসলামের নিকটবর্তী ছিল। সে কুফুর ও ঈমান ভঙ্গকারী বিষয়ে এদের চেয়ে কম সম্পৃক্ত ছিলো। অথচ সাহাবায়ে কেরাম তাদের সৈনিকদের মাঝে কোনো পার্থক্য করেননি এবং প্রতারণার শিকার হয়ে যুদ্ধে আসা ব্যক্তিদের নিকট পরিস্থিতি ঘোলাটে হওয়ার বিষয়টিকেও তাঁরা কোনোরূপ বিবেচনায় আনেননি। বরং যুদ্ধরত সকল কুফফারদের ব্যাপারে আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে ফায়সালা দিয়েছিলেন তাঁরাও তাই দিয়েছেন। নেতৃস্থানীয় হোক কিংবা সাধারণ সৈনিক, কোনও তারতম্য না করে সকলের বিরুদ্ধেই যুদ্ধ পরিচালনা করেছিলেন। আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রত্যেককে নিয়তের ওপর পুনরুত্থান করবেন।

আসল কাফেরদের ব্যাপারে এ হুকুম সরাসরি নস-কুরআন সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত আর মুরতাদ কাফেরদের ব্যাপারে সাহাবায়ে কেরামের ইজমা‘ দ্বারা প্রমাণিত। এতে কখনও মতভেদ সৃষ্টি হয়নি।

আল্লাহ তা'আলা মুমিনদেরকে উৎসাহ প্রদান করছেন-

أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَّكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُم بَدَءُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ ۚ أَتَخْشَوْنَهُمْ ۚ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ [٩:١٣]

"তোমরা কি সেই দলের সাথে যুদ্ধ করবে না; যারা নিজেদের শপথ ভঙ্গ করেছে এবং রসূলকে বহিস্কার করার সঙ্কল্প নিয়েছে? এরাই তোমাদের সাথে বিবাদের সূত্রপাত করেছে। তোমরা কি তাদেরকে ভয় করো? অথচ তোমাদের ভয়ের অধিকতর যোগ্য হলেন আল্লাহ, যদি তোমরা মুমিন হও" (সূরা তাওবা-১৩)

فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ ۚ [٢:١٩٤]

"যারা তোমাদের ওপর সীমালংঘন করেছে তোমরাও তাদের ওপর সীমালংঘন করতে পারো যেমন তারা তোমাদের ওপর সীমালংঘন করেছে"। (সূরা বাক্বারা-১৯৪)

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ۚ [٢:١٩٠]

"তোমরা আল্লাহর পথে সে সব লোকদের বিরুদ্ধে লড়াই করো যারা তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করে"। (সূরা বাক্বারা-১৯০)

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ [٢٢:٣٩]

"তাদেরকে যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হল যাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হচ্ছে। কারণ, তাদের প্রতি জুলুম করা হয়েছে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাদেরকে সাহায্য করতে সক্ষম"। (সূরা হজ্ব-৩৯)

وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ [٤٢:٤١]

"যারা নির্যাতিত হওয়ার পর প্রতিশোধ গ্রহণ করে তাদের ওপর কোনও অভিযোগ নেই"। (সূরা শুরা-৪১)

এতে লাভ কী হবে?

হে আমার মুজাহিদ ভাই! মনে রাখবেন, আপনি যখন আত্মসমর্পণ করা থেকে নিজেকে বিরত রাখলেন এর দ্বারা আপনি অন্য ভাইদের গ্রেফতার করা থেকেও তাগুতকে বিরত রাখলেন। তাদের বিরুদ্ধে আপনার সশস্ত্র মুকাবেলা, এটি তাগুত এবং তার ভাড়াটে সৈন্যদের বিপক্ষে আপনার ভাইদের সুরক্ষাকারী হবে।

মুজাহিদের নিকট এ বিষয়টি খুবই স্পষ্ট এবং তাঁরা জানেন যে, জিহাদই একমাত্র সমাধান। অস্ত্র ব্যতিত কাফেরদের আক্রমণ, শত্রুতা, অত্যাচার, সীমালঙ্ঘন এসবের প্রতিরোধ সম্ভব নয়। কাজেই এসকল মুজাহিদদের জন্য কাফিরদের মোকাবেলা-প্রতিরোধের গুরুত্ব ও উপকারিতা সম্পর্কে আলোচনা করার প্রয়োজন মনে করি না।

সুতরাং আমেরিকা বা তার দালাল শ্রেণী কিংবা অন্য কোন কাফিরেরা যাদেরকে গ্রেফতার করতে চায় এমন ব্যক্তির জানা উচিত যে, তিনি নিজের আত্মরক্ষার্থে লড়াই করে যদি নিহত হন তাহলে তো তিনি শহীদ হলেন। আর যাকে তিনি হত্যা করলেন সে জাহান্নামে নিক্ষেপিত হল। আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে এমনই আদেশ করা হয়েছে। আর যদি তিনি বেঁচে যান তাহলে তাঁর দ্বারা জারি হওয়া কল্যাণের ধারা রক্ষা পাবে। তারপর তিনি পরবর্তীদের জন্য আদর্শ হবেন এবং তাঁদেরকে বন্দীদের মুক্ত করতে উৎসাহিত করবেন এবং সাহায্য করবেন।

পাশাপাশি তিনি শত্রুদের মনোবল ভেঙ্গে দিবেন, তাদেরকে লাঞ্ছিত করবেন এবং মুজাহিদিনের কাছে তাদের দাপট খর্ব করবেন। এরপর থেকে তারা মুসলিমদের ওপর আক্রমণ করার আগে হাজার বার ভাবতে বাধ্য হবে। তিনি ওসব ভাড়াটে সৈনিকদেরকে জানিয়ে দিবেন যে, যারা সম্পদের জন্য যুদ্ধ করবে তারা মুজাহিদের কাছে পৌছার আগেই নিজের জীবন ও সম্পদ দুটোই হারাবে।

আর যদি তিনি আত্মসমর্পণ করে নিজেকে কাফিরদের হাতে তুলে দেন তাহলে তিনি নিজের ওপর কাফেরদের বিধি-বিধান চালু করার সুযোগ করে দিলেন এবং কাফেরদের সংকল্পকে দৃঢ় করে দিলেন। মুজাহিদীনের ওপর তাদের দুঃসাহস বাড়িয়ে দিলেন। তারপর নিজের ওপর বন্দীত্বের অপমান, কারাভোগের যাতনা তো এলোই, পাশাপাশি জাতির প্রতি তাঁর নিজের খেদমতগুলোও বন্ধ হয়ে গেল। অধিকাংশ সময়ই কঠিন শাস্তি ও দুর্ভোগের শিকার হতে হয়। হাতকড়া ও বেড়ির বোঝা চাপিয়ে দেয়া হয়। সর্বোপরি তিনি বন্দী হওয়ার কারণে মুজাহিদীনের গোপন বিষয়গুলো ফাঁস হয়ে যাওয়া, কাজ বন্ধ হয়ে যাওয়াসহ উম্মাহর জন্য ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াবে। আত্মসমর্পণকারী সর্বোচ্চ যা করতে পারবেন তা হচ্ছে জাতিকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিয়ে নিজেকে রক্ষা করতে পারবেন। বরং বড় ধরনের বিপদের সম্মুখীন হয়ে নিজের দ্বীন ও আখিরাত ধ্বংস করে দুনিয়া রক্ষা করতে পারবেন।

অথচ তিনি আশঙ্কামুক্ত হতে পাচ্ছেন না, প্রহসনের বিচারকের রায়ে তাঁর মৃত্যুদন্ডও হতে পারে। সুতরাং আত্মসমর্পণ তাঁর অপছন্দনীয় বিষয়ই বৃদ্ধি করবে এবং সে যা আশঙ্কা করত সেটাই তরান্বিত হবে।

আর যে ব্যক্তি নিহত হওয়া পর্যন্ত দৃঢ় থাকবে তাঁর জন্য আসহাবুল উখদুদের ঘটনাই যথেষ্ট যে, তাঁদের সে মহিলার অবস্থা কেমন হয়েছিল যে তাঁর নীতি থেকে সরে না গিয়ে, আকীদা-বিশ্বাস সংরক্ষণ করতে সন্তানসহ নিজেকে আগুনে নিক্ষেপ করেছিল।

বরং সে যেন এ যুগের উদাহরণ লক্ষ্য করে এবং শাইখুল মুজাহিদ উসামা বিন লাদেন রহ. কে হস্তান্তর করতে অস্বীকৃতির ওপর অটল থাকা দুঃসাহসী বীর আমীরুল মু'মিনীন মোল্লা মুহাম্মাদ উমর রহ. এর অবস্থা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে। তিনি সেদিন মুরতাদদের ব্যাপারে আবু বকর সিদ্দীক রাযি.র অবস্থান, 'খালক্বে কুরআন' ফিতনার সময় ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রহ.র অবস্থান এবং তা'তীল (আল্লাহর গুণবাচক নামকে অস্বীকারকারীদের) ফেতনার সময়ে ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ রহ.র অবস্থান পুনরুজ্জীবিত করেছিলেন।

সুতরাং কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি কি তাঁদের কারো ব্যাপারে এমন বলবে যে, এসব দ্বারা তাঁরা কী অর্জন করেছেন?

সুতরাং আত্মসমর্পণ না করে দৃঢ়পদ থাকা এবং লড়াই করতে থাকা, শরয়ী বিধান আঁকড়ে থাকা, শাহাদাত বরণ, মুজাহিদীনকে উদ্বুদ্ধ করা, কাফিরদেরকে শক্তিহীন ও অপদস্থ করা, বন্দী হয়ে নিজের ওপর কাফেরদের বিধান প্রতিষ্ঠিত করা থেকে নিরাপদ থাকা, তাদের শাস্তি ও দুর্ভোগ থেকে নিরাপদ থাকা এবং মুজাহিদীনের গোপনীয়তা রক্ষা করা এসবই এক একটি উপকারিতা।

তিনি দুনিয়া অর্জন করতে না পারলেও দ্বীন রক্ষার্থে সহায়তার করতে পেরেছেন। তিনি নিজের অংশ অর্জন করতে না পারলেও উম্মাহর কল্যাণ রক্ষা করেছেন। দুনিয়া এবং আখেরাতের কল্যাণ আল্লাহর রাস্তায় নিহত হওয়া থেকে বাঁচতে আত্মসমর্পণের চেয়ে নিকৃষ্ট কাজ আর কী হতে পারে? যার ফলে অনেক প্রাণের বিনিময়ে অর্জিত কাজগুলো নষ্ট করে দেয়।

আত্মসমর্পণের ক্ষতির ভয়াবহতা বুঝতে এতটুকুই যথেষ্ট যে, জিহাদের গোপন বিষয়সমূহ অবগত আছেন এমন ব্যক্তির জন্য নিহত হওয়াটা গ্রেফতার হওয়ার চেয়ে সহজতর। মুহাম্মাদ বিন ইবরাহীম, হামূদ বিন উকলা রহ. সহ অন্যান্য আলিমগণ এমনটিই ফতোয়া দিয়েছেন। আর এর ওপর শরীয়তের স্পষ্ট দলীল-প্রমাণ বিদ্যমান রয়েছে। আল্লাহর কসম! যে বিষয়টি আত্মহত্যা পর্যন্ত বৈধ করে দেয় তা নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ। আর এই মহান কাজে যে ঝুঁকি রয়েছে তা অবশ্যই অনেক বড় ঝুঁকি।

এখন তো সময় ফুরিয়ে গেছে

এখন আমি এমন দু'টি বিষয়ের প্রতি মনযোগ আকর্ষণ করতে চাচ্ছি যার বিস্তর ব্যবধান থাকা সত্বেও বাহ্যিকভাবে সামঞ্জস্য রাখে।

প্রথমটি হচ্ছে, বুখারী এবং মুসলিমে হযরত আনাস ইবনে মালিক রাঃ থেকে বর্ণিত একটি হাদিস-

أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وله ما على الأرض من شيء إلا الشهيد يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل عشر مرات لما يرى من الكرامة

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, এমন কোন ব্যক্তি নেই যে জান্নাতে যাওয়ার পর পুনরায় দুনিয়ায় প্রত্যাবর্তনের করতে চাইবে, যদিও তাঁকে দুনিয়ার সবকিছু দিয়ে দেয়া হয়। একমাত্র শহীদ এ আকাংক্ষা করবে। সে শাহাদাতের মর্যাদা প্রত্যক্ষ করার কারণে আবারো দশবার দুনিয়াতে প্রত্যাবর্তন করার এবং প্রতিবার শাহাদাত লাভ করার আকাংক্ষা করবে।

দ্বিতীয়টি হচ্ছে, যে ব্যক্তি শত্রুর নিকট আত্মসমর্পণ করার ফলে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির মুখোমুখি হয় এবং সেখানে বসে মৃত্যুদূতের সাথে সাক্ষাতের আকাঙ্ক্ষা করে এবং কখন মৃত্যু আসবে তার অপেক্ষা করে।

এদের উভয়েই মৃত্যু কামনা করে থাকে, উভয়েই দশবার নিহত হওয়াটাও সহজ হিসাবে কামনা করে থাকে।

কিন্তু শহীদ এটি কামনা করবে এই মৃত্যুর মর্যাদা প্রত্যক্ষ করার কারণে আর আত্মসমর্পণকারী ব্যক্তি তা কামনা করে থাকে এর লাঞ্ছনা প্রত্যক্ষ করার কারণে। শহীদ ব্যক্তি শাহাদাতের ফযীলত প্রত্যক্ষ করেছে আর এটি সে বারবার পাওয়ার জন্য শহীদ হতে চাইবে। আর আত্মসমর্পণকারী তার আত্মসমর্পণের পরিণতি দেখে তা থেকে পরিত্রাণ পেতে মৃত্যু কামনা করবে।

সুতরাং একজন মুজাহিদ ভাই যেন অবস্থা নিজের নিয়ন্ত্রণে থাকা অবস্থায় এগুলো বিবেচনা করেন। জেনে রাখুন, যিনি নিজেকে বাঁচানোর জন্য শত্রুর নিকট সমর্পণ করবেন, শত্রুর বিচারালয়ে যাবেন, অচিরেই এটা তাঁর জন্য আফসোসের কারণ হয়ে দাঁড়াবে এবং এমন সময় তিনি অনুতপ্ত হবেন যখন তাঁর অনুতাপ আর কাজে আসবে না।

সুতরাং যিনি নিহত হওয়ার ভয়ে আত্মসমর্পণ করেন তিনি এটা বুঝতে পারেন না যে, তাঁকে নিহত হওয়ার চেয়ে ভয়ঙ্কর ও কঠিন যন্ত্রনাদায়ক অবস্থার মুখোমুখি হতে হবে। তারপর তাঁকে প্রহসনের বিচারকের ফায়সালা অনুযায়ী হত্যা করা হবে। আর যিনি কষ্ট ও জখমের ভয়ে আত্মসমর্পণ করেন তিনি তো রিমান্ডের বিভিন্ন প্রকার যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি থেকে নিরাপদ নন।

আর যখন তিনি জানতে পারবেন যে, অমুক অমুক কাজগুলো শুধুমাত্র তাঁর আত্মসমর্পণের কারণেই নষ্ট হয়েছে, অমুক অমুক মুজাহিদকে তাঁর স্বীকারোক্তির কারণেই গ্রেফতার করা হয়েছে। অথচ তিনি এগুলো থেকে বেঁচে থাকতে সক্ষম ছিলেন কিন্তু থাকেননি। তিনি নিজেকে এবং সে সমস্ত মুজাহিদীন ভাইদেরকে বাঁচাতে সক্ষম ছিলেন কিন্তু বাঁচাননি। তখন যত শাস্তিই তিনি পান তাঁর নিজের কাছে সেটা কম শাস্তি বলেই মনে হবে।

তিনি যখন ভাইদের আর্তচিৎকার শুনবেন এবং তাঁদের ব্যপারে তাঁর স্বীকারোক্তির কথা মনে পড়বে, তাদেরকে শাস্তি দেয়া হচ্ছে, পরস্পর পরস্পরকে দেখতে পাবেন এবং দেখতে পাবেন যে, জিহাদের কাজ বিলম্বিত হচ্ছে তখন তাঁর এই আত্মসমর্পণ তাঁর জন্য খুবই কষ্টের কারণ হবে।

আর যদি তিনি লড়াই করতেন তবে তিনি মুক্তি পেতেন এবং তাঁর আমল পূর্ণতা পেত। অথবা শহীদ হতেন তাহলে তো তিনি তাঁর নির্ধারিত সময়েই চলে যেতেন। তারপর তিনি আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছায় চিরস্থায়ী জান্নাতের নেয়ামত উপভোগ করতেন।

তখন তিনি মনে মনে আফসোস করে নিজেকে বলতে থাকবেন, হায়! যদি আত্মসমর্পণ না করতাম! হায়! যদি শহীদ হওয়া পর্যন্ত লড়াই করতাম!

কিন্তু তখন এ কথা বলা ছাড়া আর কিছুই করার থাকবে না যে,

'এখন তো সময় ফুরিয়ে গেছে!'

প্রতারণার শিকার ব্যক্তিদের আহবানে সাড়া দিবেন না

হে মুজাহিদ ভাই!

শীঘ্রই আপনি প্রতারণার শিকার তোমার ভাই, বন্ধু-বান্ধব, পরিবার ও নিকটাত্মীয়দের আহবান শুনবেন। পাশাপাশি আলেম নামধারী কিছু লোক এবং (সৌদির স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী) নায়েফ ও তার সাঙ্গপাঙ্গের আহবানও শুনবেন। সংবাদ মাধ্যম নামক তোতা পাখিগুলোর মুখ থেকেও বিভিন্ন আহ্বান আপনি শুনবেন।

অচিরেই আপনার পিতা, ভাই আপনাকে ডাকবে, অন্যান্য লোকজনও আপনার ব্যাপারে আলোচনা করবে। তারা সবাই আপনাকে (জিহাদের পথ থেকে) ফিরে এসে (সরকারের কাছে) আত্মসমর্পণ করার উপদেশ দিবে। তারা আপনাকে জালিম তাগুতদের ক্ষমা এবং আপনার প্রতি তাদের দয়ার কথা শোনাবে। অথচ ওসব জালিমরা কীভাবে ক্ষমাশীল ও দয়ালু হতে পারে? যখন তাদের অন্তর আল্লাহর দ্বীনের ব্যাপারে বিদ্বেষে ভরা এবং আল্লাহর বিধান মেনে নিতে তারা মোটেই প্রস্তুত নয়।

এ ক্ষেত্রে শরীয়তের হুকুম কী, আপনি যখন জানতে পারলেন অতএব জেনে রাখুন, এটা (আপনার জন্য বড়) একটি ফিতনা ও পরীক্ষা। তাই আপনি আল্লাহর নিকট দৃঢ়তা কামনা করুন এবং সকল বিষয়ে তাঁর ওপরই ভরসা করুন।

জেনে রাখুন, আপনার সত্যিকারের কল্যাণকামী আপনার মুক্তিই কামনা করে। সে আশা করে, আপনি যেন শত্রুর হাতে ধরা না পরেন। সে আপনার জন্য দোয়া করে, আপনি যেন শত্রুর হাত থেকে নিরাপদ থাকেন। সে যদি আপনাকে রক্ষা করতে ও নিরাপত্তা দিতে পারতো তাহলে অবশ্যই তা করতো। আর শত্রুর কল্যাণকামী কখনো আপনাকে তার কথা দিয়ে সাহায্য করবে না। সে শুধু তার মনিবের আদেশ পালনের চেষ্টাই করবে এবং মনিবের আস্থাভাজন হওয়ার চেষ্টা করবে। অতএব, আপনার জন্য সমীচীন হলো, যে কথা আপনার কাজে আসবে না সে কথার প্রতি আপনি কর্ণপাতই করবেন না।

আপনার মা-বাবাও আপনার জন্য মৃত্যুর দোয়া করতো

জেনে রাখুন, আপনার মমতাময়ী মা ও স্নেহশীল পিতা যদি বাস্তবতা বুঝতেন, তাগুতদের কারাগারগুলোতে কী হয়, তা যদি তাঁরা জানতেন এবং আপনি তাদের হাতে গ্রেফতার হলে আপনার জন্য যে কী ভয়ানক জুলুম-নির্যাতন অপেক্ষা করছে তা যদি তাঁরা বুঝতেন তাহলে আপনার জন্য তাঁরা এ দোয়াই করতেন যেন, দ্রুত আপনার মৃত্যু এসে যায়। তবুও যেন আপনি নায়েফ ও তার সাঙ্গপাঙ্গের হাতে গ্রেফতার না হন। (আল্লাহ তাদেরকে উপযুক্ত শাস্তি দিন) আর এটা আপনার জন্য বদ দোয়া নয়, দোয়াই হতো।

আর কেউ কি ওই পাপিষ্ঠ নায়েফকে সত্যবাদী মনে করে? যখন কিছু লোক নিজেদের সন্তান হারিয়ে তার কাছে তাদের সন্তান ফিরিয়ে দেয়ার দাবী করেছিলো আর সে তাদেরকে বলেছিলো যে, অবশ্যই তাদের সন্তান ফিরিয়ে দিবে। সে মিথ্যা বলেছে (আল্লাহ তাকে উপযুক্ত শাস্তি দিন) আশ্চর্য! কীভাবে ওই পাপিষ্ঠ নায়েফ মুসলমানদের সন্তানদেরকে তাদের মা-বাবার কাছে ফিরিয়ে দেয়ার কথা বলে! (অথচ সেই তাদেরকে বিনা অপরাধে গ্রেফতার করে তাঁদের ওপর জুলুম নির্যাতন চালাচ্ছে)

তারা হয় অজ্ঞ, না হয় দ্বীন বিক্রিকারী

সরকারি ফতোয়া বিভাগের বেতনভুক্ত গদীনশীন শায়েখ ও অন্যান্য তোষামোদকারীরা হয় বাস্তবতা সম্পর্কে একেবারেই জাহেল-অজ্ঞ, না হয় এমন কর্মচারী যারা নিজের দ্বীন-ধর্মকে পার্থিব সম্পদের বিনিময়ে বিক্রি করে দিয়েছে। এ ছাড়া তৃতীয় কিছু নয়।

তাদেরকে মাত্র তিনটি প্রশ্ন করুন

আপনি যদি ওসব শাইখদের ফতোয়া এবং আপনার কাছ থেকে তারা যা চাচ্ছে তার বাস্তবতা সম্পর্কে জানতে চান তাহলে তাদের যে কাউকে মাত্র তিনটি প্রশ্ন করুন,

১) ওই ব্যক্তির ওপর কি আত্মসমর্পণ করা আবশ্যক যাকে কাফেররা তলব করছে? অথবা কাফের রাষ্ট্রের কোনো উকিল তলব করছে যে উকিল কাফেরদের চাহিদানুযায়ী কাজ করে এবং তাদের কাজ বাস্তবায়ন করে এবং (মুসলিমদেরকে ধরে ধরে) জেলে বন্দী করে?

২) ওই ব্যক্তির ওপর কি আত্মসমর্পণ করা আবশ্যক যে নিশ্চিত ভাবে জানে যে, তাকে তলব করা হয়েছে শরীয়াহ অনুযায়ী তার বিচার করার জন্য নয় বরং (তাদের নিজের বানানো আইনে বিচার করার জন্য আবার) অনেক ক্ষেত্রে তার কোনো বিচারই করা হবে না। না শরীয়াহ আইনে, না অন্য কোনো আইনে।

৩) ওই ব্যক্তির ওপর কি আত্মসমর্পণ করা আবশ্যক যে জানে যে, তাকে অন্যায় ভাবে বছরের পর বছর জেলে বন্দী করে রাখা হবে এবং তার ওপর বিভিন্ন ধরনের জুলুম নির্যাতন করা হবে?

এই প্রশ্নগুলোই এখানে বাস্তবতা। যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে, ইলমের সাথে যার কিছু হলেও সম্পর্ক আছে সে কখনোই এসব ক্ষেত্রে আত্মসমর্পণের ফতোয়া দিবে না। একমাত্র ওই লোকই আত্মসমর্পণের ফতোয়া দিবে যে নিজের দ্বীন-ধর্ম বিক্রি করে দিয়েছে অথবা যে বাস্তবতা সম্পর্কে একেবারেই জাহেল-অজ্ঞ।

কাজেই ওরা আপনাকে আল্লাহর হুকুম থেকে কীভাবে ফিরিয়ে রাখবে? যারা হয় তাগুতের রক্ষাকারী -যাদের সব কিছুই ধ্বংস হয়ে যাবে এবং যাদের সব আমলই বাতিল বলে গণ্য হবে- অথবা গণ্ডমূর্খ ও কাফেরদের দ্বারা প্রতারিত।

তাঁরা যা করেছেন আপনিও তা-ই করুন

আল্লাহর শত্রুরা যখন আপনাকে খুঁজতে আসবে তখন আপনি পালিয়ে যান এবং তাদের দৃষ্টির আড়ালে চলে যান। এ ব্যাপারে চেষ্টায় কোনো ধরনের ত্রুটি করবেন না। এ ক্ষেত্রে আপনি সে সব মহান ব্যক্তিদের অনুসরণ করুন যারা আপনার পূর্বে পলায়ন করেছেন। আপনি হযরত মূসা আ. এর অনুসরণ করুন যিনি ফেরাউন থেকে পালিয়ে আত্মগোপন করেছিলেন। আপনি আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণ করুন যিনি কুরাইশদের থেকে আত্মগোপন করে আরকাম বিন আবি আরকাম রাযি. এর বাড়িতে অবস্থান করেছিলেন এবং সেখানেই তিনি অতি গোপনে সাহাবীদের সাথে বৈঠক করতেন। যিনি হিজরতের দিন হযরত আবু বকর রাযি.কে সঙ্গে নিয়ে কুরাইশদের থেকে পালিয়ে গিয়েছিলেন এবং সাওর গুহায় আত্মগোপন করেছিলেন।

এরপর আপনি ওই ব্যক্তিদের অনুসরণ করুন যারা তাঁদের পর পালিয়ে গিয়েছিলেন এবং আত্মগোপনে ছিলেন। ওয়ালিদ বিন আব্দুল মালিক যখন খলীফা হলো তখন মদীনার বিশিষ্ট আলেম হাফেজে হাদীস ইমাম যুহরী রাযি. রোমে পালিয়ে যাওয়ার ইচ্ছা করেছিলেন। হাজ্জাজ বিন ইউসুফের শাসনামলে হযরত হাসান বসরী রহ. সহ অনেক তাবেয়ী আত্মগোপনে ছিলেন। এমনকি তাদের সম্পর্কে এক ব্যক্তি "মুতাওয়ারীন" (আত্মগোপনকারীগণ) নামে একটি কিতারও রচনা করেছিলেন। খলকে কুরআনের ফিতনার সময় ইমাম আহমদ বিন হাম্বাল রহ. সহ সালাফদের বিশাল একটি দল আত্মগোপন করেছিলেন।

(দ্বীনের জন্য) পালিয়ে বেড়ানো এবং আত্মগোপন করার ধারা সব যুগেই ছিলো। বর্তমানেও এ ধারা অব্যাহত আছে। বর্তমানেও অনেক আলেম আত্মগোপনে রয়েছেন। যেমন, শায়খ নাসির বিন হামাদ আল ফাহাদ, শায়েখ আলী বিন খুদাইর আল খুদাইর, শাইখ আহমাদ আল খালেদী, শায়খ আব্দুল্লাহ আর রশূদ সহ আরও অনেকে।

অস্ত্র তুলে নিন এবং যুদ্ধ করুন

যদি যমীন আপনার জন্য সংকীর্ণ হয়ে যায়, পালাতে সক্ষম না হন তাহলে অস্ত্র তুলে নিন এবং তাদের সাথে যুদ্ধ করুন। আপনার উপর আক্রমণকারীকে প্রতিহত করুন। এরপর আপনি চাইলে মরণপণ যুদ্ধ করুন এবং শাহাদাৎ বা বিজয় দুটির কোনো একটা লাভ করুন। অথবা চাইলে যুদ্ধের কৌশল পরিবর্তন করতে পারেন বা বড় দলের নিকট আশ্রয় নিতে পারেন। এ ক্ষেত্রে আপনার আমীর আপনাকে কী আদেশ দেন তার অপেক্ষা করুন। তিনি যদি আপনাকে পিছনে সরে আসতে বলেন তাহলে তাই করুন। যদি যুদ্ধ করার আদেশ দেন তাহলে যুদ্ধ করুন যেন আপনার দেহ নিস্তেজ না হওয়া পর্যন্ত মুরতাদরা আপনার কাছে পৌঁছতে না পারে।

অতীতে ও বর্তমানে আপনার পূর্বে বহু মুজাহিদ এ কাজ করেছেন। এ ক্ষেত্রে আপনার অনুসরণীয় হতে পারে শাইখ আসেম, যিনি আত্মগোপন করে নিজেকে রক্ষা করেছিলেন। শাইখের পর এ পর্যন্ত আরও অনেকেই এমন করেছেন। আপনি কি মুজাহিদ আলেম ইউসুফ আল উয়াইরী রহ.কে দেখেননি? কীভাবে তিনি শত্রুদের রক্ত ঝরিয়েছেন এবং নিজেকে উৎসর্গ করেছেন।

শত্রুদের অনেককে হত্যা করার পর তিনি শহীদ হয়েছেন। আপনি কি বীর মুজাহিদ তুরকী দানদানী রহ. ও তাঁর সঙ্গে থাকা মুজাহিদদের ঘটনা জানেন না? তাঁরা মুরতাদদের প্রচুর রক্ত ঝরানোর পর শাহাদাত বরণ করেছিলেন। মুরতাদরা তাদের রক্তকে সস্তায় লাভ করতে পারেনি।

আপনি কি বিশিষ্ট মুজাহিদ আহমাদ আদ দাখীল ও তার সঙ্গীদের কথা শুনেননি? যখন তাদের ওপর বিরাট সৈন্যদল আক্রমণ করেছিলো আর তাঁরা আক্রমণ প্রতিরোধ করেছিলেন এবং শত্রুর মোকাবেলায় ধৈর্যশীল ও দৃঢ়পদ ছিলেন। ফলে তাদের দেহে এক ফোঁটা রক্ত বিন্দু অবশিষ্ট থাকা পর্যন্ত শত্রুরা তাঁদের কাছে পৌঁছাতে পারেনি।

আপনি যদি তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে দ্বিধা করেন অথচ এ লড়াই বৈধ হওয়ার সব দলিল আপনার জানা আছে তাহলে শুনে রাখুন, ওসব মুরতাদরা কিন্তু আপনার বিরুদ্ধে লড়াই করতে একটুও দ্বিধা করে না। অথচ তাদের কাছে 'আমি হুকুমের গোলাম' এই একটি মাত্র দলিল (?) ছাড়া আর কোনও দলিল নেই।

আপনি যদি তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে দ্বিধা করেন তাহলে শুনে রাখুন, তারা মুজাহিদদেরকে পাইকারী ভাবে হত্যা করেছে। তাঁদের ওপর কোনও দয়া করেনি। তাঁদের ব্যপারে কোনো চুক্তি বা প্রতিশ্রুতির ধার ধারেনি। আরও শুনুন, তারা শাইখ ইউসুফ আল উয়াইরী রহ.কে শহীদ করেছে। তিনি নির্ভয়ে তাদের কাছে আত্মসমর্পণ করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিলেন। ফলে তারা তাঁকে অপ্রস্তুত অবস্থায় আক্রমণ করেছিলো। তারা তুর্কী দানদানী রহ.কেও শহীদ করেছে। তিনি যে মসজিদে আশ্রয় নিয়েছিলেন তাও তারা ধ্বংস করে দিয়েছিল।

তাই আল্লাহর পথে লড়াই করুন, আল্লাহর আদেশ পালন করুন, রাসূলুল্লাহর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দেখানো পথে চলুন এবং আল্লাহর পথের মুজাহিদের অনুসরণ করুন। তাঁরা যা করেছেন আপনিও তা-ই করুন।

নিজের প্রাপ্য বুঝে নিন

হে আমার মুজাহিদ ভাই! আপনার যে সব ভাই আত্মসমর্পণ করেছেন তাদেরকে আপনি দেখেছেন, এ ব্যাপারে শরীয়তের বিধান কী, তাও আপনি জেনেছেন এবং আপনার কাঁধে মুজাহিদদের গোপন তথ্যাদির যে বিরাট আমানত রয়েছে তা আপনি বুঝতে পারছেন। পাশাপাশি আত্মসমর্পণ করলে আপনার জন্য যে কী কঠিন বিপদ অপেক্ষা করছে তাও আপনি জেনেছেন। আপনি নিজেও জানেন না, তখন কি আপনি ধৈর্য ধারণ করতে পারবেন? না, ফেতনার শিকার হয়ে যাবেন?

আর এতেও কোনো সন্দেহ নেই যে, যার অন্তরে আত্মমর্যাদাবোধ আছে, যে পরকালকে ইহকালের ওপর প্রাধান্য দিয়েছে সে শত্রুর সামনে আত্মসমর্পণ করতে এবং শত্রুকে নিজের ওপর ক্ষমতা প্রদান করতে কিছুতেই রাজি হবে না। শুধু নিজের দেহের ওপর নয় বরং নিজের দ্বীনের ওপর, মুজাহিদদের অবস্থানের জায়গাগুলোর ওপর এবং তাদের গোপন তথ্যাদির ওপর।

সুতরাং আপনি যখন আল্লাহর ওপর পূর্ণ আস্থা ও ভরসা নিয়ে আপনার সিদ্ধান্তকে পাকাপোক্ত করলেন (যেমনটা আপনার ব্যাপারে আমার বিশ্বাস) অতএব জেনে রাখুন, এটি এমন একটি বিষয় যেখানে ছাড় দেয়া বা সহনশীলতা দেখানোর কোনও সুযোগ নেই। লড়াইয়ের সময় কিছুতেই অন্য কোনো কাজে ব্যস্ত হবেন না। যখন আপনি শত্রুর মুখোমুখি হবেন তখন আপনার যে যে অস্ত্র প্রয়োজন, যা যা আপনি নিতে সক্ষম সবই সাথে নিয়ে নিন। পিস্তল তুলে নিন, মেশিনগানও নিন। যে যে বোমা বহন করতে পারবেন তা থেকে আপনার পকেট যেন খালি না থাকে। যখন যে শক্তি সঞ্চয় করা আপনার পক্ষে সম্ভব তখন তা সঞ্চয় করে রাখা আপনার ওপর অবশ্য কর্তব্য।

আপনি ওসব কিছু আমেরিকার জন্য যেমন প্রস্তুত করে রেখেছেন, তাদের দোসরদের জন্যও প্রস্তুত করে রাখুন। প্রস্তুতি গ্রহণের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা যে আদেশ দিয়েছেন তার ব্যাপকতার মধ্যে এটাও শামিল।

যখন আপনি শত্রুর মুখোমুখি হবেন তখন লড়াই শুরু করার পূর্বে এবং লড়াই চলাকালে আল্লাহ তা'আলা আপনাকে যে যে আদেশ করেছেন তা স্মরণ করুন। পাশাপাশি বেশি বেশি যিকির করুন। তাকবীর দিন। (শত্রুর মোকাবেলায়) অবিচল থাকুন। আল্লাহর কাছে দৃঢ়তা কামনা করুন এবং দুনিয়া থেকে মুখ ফিরিয়ে নিন। নিয়তকে আল্লাহর জন্য খালেস করে ফেলুন। আপনার এই আত্মরক্ষাকে আল্লাহর রাস্তায় তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করুন। আর স্মরণ রাখবেন, আপনার এ লড়াই জিহাদের পথে চলমান একটি আমল, যা বহু আগ থেকেই চলে আসছে। এ পথেই চলেছেন মুজাহিদদের সর্দার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে নিয়ে অগনিত মুজাহিদীন।

আপনার জন্য ভালো হবে একা না থেকে জিহাদের কাজে সক্রিয় ভাইদের সাহায্য গ্রহণ করা। পারলে তাঁদেরকে খুঁজে বের করুন। তাঁদের কাছ থেকে সাহায্য নিবেন শুধু এজন্যই যে তাঁদেরকে খোঁজে বের করবেন, ব্যাপারটি শুধু এতটুকু নয়, বরং তখন তা করা আপনার উপর ফরজে আইন হয়ে যায়, পূর্বে যেমন আলোচনা করা হয়েছে।

আর যদি জিহাদের কাজে সক্রিয় ভাইদের সাহায্য পেতে অক্ষম হন তাহলে আপনার যে ভাইরা মুজাহিদ হবে বলে আশা করা যায় তারা যেন একত্রিত হয়। আপনি একথা বলবেন না যে, এটা তো খুবই সহজ। (যখন তখনই করে ফেলতে পারবো) কারণ, (আগ থেকে তাঁদেরকে একত্রিত না করে থাকলে) যখন শত্রুর মুখোমুখি হবেন তখন অনুতপ্ত হবেন এবং বুঝবেন, বিষয়টা কত যে কঠিন!

কাজেই সবাই ঐক্যবদ্ধ হোন এবং সাধ্যনুযায়ী শক্তি অর্জন করুন এবং প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র মজুদ করে রাখুন। আর জরুরি অবস্থার জন্য আগ থেকেই একটি প্ল্যান-পরিকল্পনা ঠিক করে রাখুন। পাশাপাশি পাহারার ব্যবস্থা রাখুন। সব সময় না হলেও অন্তত অধিকাংশ সময়।

হে আমার মুজাহিদ ভাইয়েরা!

আপনারা ধৈর্য ধারণ করুন, ধৈর্য ধারণের ব্যাপারে প্রতিযোগিতা করুন, সব সময় যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকুন এবং (সর্ব বিষয়ে) আল্লাহকে ভয় করুন আর জেনে রেখুন, ইনশআল্লাহ বিজয় অবশ্যই অতি নিকটে।

আপনারা হচ্ছেন আল্লাহর এমন কিছু বান্দা যারা আল্লাহর ইবাদতে মগ্ন রয়েছেন। সুতরাং আল্লাহর আদেশ পালনের ক্ষেত্রে ধৈর্য ধারণ করুন। (মনে রাখবেন) দুনিয়া হলো চলার পথের খনিকের ঘর এবং পরীক্ষার যায়গা। কেউ যদি বলে, সামান্য সময় ধৈর্য ধরার নামই হল বীরত্ব ও বাহাদুরি, তবে আমরা বলবো, পুরো দুনিয়াটাই সামান্য সময় ধৈর্য ধরার জায়গা।

সব প্রস্তুতি সম্পন্ন করার পর বিপদ দূর না হওয়া পর্যন্ত যথাসম্ভব চলাফেরা কমিয়ে দিন। (এক জায়গায় অবস্থান করুন) কারণ, কথায় আছে, চলাফেরাকারীদের একে অপরের সাথে দেখা হয়েই যায়। কাজেই বাইরে চলাফেরা করা, কোথাও অবস্থান করা, যানবাহনে চড়া এবং অন্যদের সাথে যোগাযোগ করার ক্ষেত্রে নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করুন এবং কখনো খালি হাতে থাকবেন না। বরং সব সময় নিজের সাথে একটি অস্ত্র রাখবেন যা আপনার (আত্মরক্ষার জন্য) যথেষ্ট হবে।

সবর্দা (মৃত্যুর জন্য) প্রস্তুত থাকবেন। প্রয়োজনীয় ওসিয়ত লিখে রাখবেন। (কারো সাথে দেনা পাওনা থাকলে বা) কারো ওপর জুলম করে থাকলে তা থেকে পরিত্রাণ লাভ করবেন এবং সকল গুনাহ থেকে আল্লাহর নিকট তওবা করে ফেলবেন। পাশাপাশি নফল আমল বেশি বেশি করতে থাকবেন এবং অন্যান্য মুজাহিদদেরকেও এ কাজগুলো করার প্রতি উৎসাহিত করবেন। তাঁরা যেন ফেতনায় না পড়ে যায়, এ ব্যাপারে তাঁদেরকে সতর্ক করবেন এবং শত্রুর কাছে আত্মসমর্পণ করা থেকেও তাঁদেরকে সতর্ক করবেন। এই মাসআলাটিকে শরীয়তের সুস্পষ্ট দলিলসহ তাঁদের সামনে তুলে ধরবেন। তাঁদেরকে এ ফরয বিধান পালনের প্রতি আহ্বান জানাবেন এবং দুনিয়ার প্রতি ঝুঁকে যাওয়া থেকে আল্লাহর ভয় দেখাবেন।

আজকের দিনের সূর্য যেন এমন অবস্থায় অস্ত যায় যে, (শত্রুর মোকাবেলা করার জন্য) আপনি আপনার সাধ্যানুযায়ী শক্তি অর্জন করেছেন এবং পরিপূর্ণ প্রস্তুতি গ্রহণ করেছেন।

(মৃত্যুর জন্য) আপনার প্রস্তুতি গ্রহণ পুরোপুরি সম্পন্ন হলে মৃত্যুকে হাসিমুখে স্বাগত জানান এবং 'শাহাদাতের মৃত্যু'কে লক্ষ্য করে বলুন, এসো আমার কাছে, এসো আমার কাছে। (আমি তোমার জন্য পুরোপুরি প্রস্তুত) এরপর নিজের প্রাপ্য বুঝে নিন।

পরিশিষ্ট

হে আমার মুজাহিদ ভাই!

আপনি কোনো কাফেরের হাতে বন্দি হবেন না, যে আপনাকে আল্লাহর হুকুম পালন করার কারণে শাস্তি দিবে তার হাতেও না। এবং তার হাতেও না, যে আপনার ব্যাপারে শরীয়াহ অনুযায়ী বিচার করবে না, বরং কোনো বিচারই করবে না। (ভাই!) আপনি কোনো ভাবেই বন্দিত্ব বরণ করবেন না, নয়তো দ্বীনের ব্যাপারে ফেতনার শিকার হয়ে যাবেন।

(হে আমার ভাই) আপনি কোনো ভাবেই বন্দিত্ব বরণ করবেন না। কারণ, আপনি তো জানেন, কারাগার কী জিনিস! ইতিপূর্বে যারা আত্মসমর্পণ করেছে এবং শত্রুদের হাতে বন্দি হয়েছে তাদের উপর দিয়ে ঘটে যাওয়া সীমাহীন যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির বহু রক্তাক্ত ঘটনা আপনি শুনেছেন। এখন আপনার করণীয় কী, তা আপনি ভালো করেই জানেন।

আপনি যখন এই বিষয়গুলো জানলেন তো এখন আমেরিকার পক্ষ থেকে বা তার দোসরদের পক্ষ থেকে যেই আপনাকে খোঁজ করতে আসবে এবং তাদের পক্ষ নিয়ে আপনার সাথে লড়াই করতে আসবে তার ব্যাপারে কোনো ধরনের সংকোচ করবেন না। নিজেকে রক্ষা করার জন্য তাকে হত্যা করতে একটুও দ্বিধা করবেন না। কেউ যদি আপনার সম্পদ ছিনিয়ে নিতে চায় তাহলেই শরীয়ত তাকে হত্যা করার অনুমতি দিয়েছে তাহলে যে আপনার সম্মান নষ্ট করতে চায়, আপনাকে অপমানিত করতে চায়, তার হুকুম কী হবে?

লড়াই করলে কী লাভ হবে?

আপনি যদি পালাতে না পারেন তাহলে লড়াই করুন। একথা বলবেন না যে, এতে কী লাভ হবে? (মনে রাখবেন, এতে আপনার নিজের এবং অন্যান্য মুসলিমদের বহু লাভ হবে। যেমনঃ

১ম লাভ হল, আপনি আল্লাহ তা'আলার হুকুম পালন করলেন।

২য় লাভ হল, আপনি শাহাদাত অর্জন করলেন।

৩য় লাভ হল, আপনি মুসলিমদেরকে (ওসব মুরতাদদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে) উৎসাহিত করলেন।

৪র্থ লাভ হল, আপনি কাফেরদেরকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করলেন।

৫ম লাভ হল, আপনার নিকট মুজাহিদদের যে গোপন আমানত ছিল তা রক্ষা করলেন। (বলুন, আপনি এগুলোর কোনটাকে ছোট বলবেন?)

জেনে রাখুন, আজকে আপনি যদি বন্দী হন তাহলে আগামীকাল অবশ্যই এ আকাঙ্ক্ষা করবেন যে, হায়! যদি লড়াই করতাম এবং শহীদ হতাম!! কিন্তু ততক্ষণে সময় ফুরিয়ে যাবে।

গুজব রটনাকারী ও নিরুৎসাহিতকারীদের কথায় কান দিবেন না। তারা হয়তো স্বীয় প্রবৃত্তির দাস, তাগুতের সৈন্য, নয়তো অজ্ঞ ও প্রতারিত। আপনি বরং সেই সব মহান ব্যক্তিদের প্রতি লক্ষ করুন, যারা আপনার পূর্বে পলায়ন করেছেন এবং আত্মগোপন করেছেন এবং তাঁদের প্রতি লক্ষ করুন, যারা আত্মরক্ষার জন্য লড়াই করে শহীদ হয়েছেন বা নিজেকে রক্ষা করতে পেরেছেন। তাঁরা যা করেছেন আপনিও তা-ই করুন।

আপনি এখন থেকেই লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করুন এবং সামর্থ অনুযায়ী শক্তি অর্জন করুন। আগ্রাসী শত্রু তার সমস্ত শক্তি নিয়ে এগিয়ে আসছে। দেখুন, সে (আপনাকে) ভয় দেখাচ্ছে, ধমক দিচ্ছে এবং ক্রোধে ফেটে পড়ছে। সে যেন আপনার কাছ থেকে প্রত্যাখ্যান ও প্রতিরোধই পায় এবং আপনার দেহে এক ফোঁটা রক্ত অবশিষ্ট থাকতে সে যেন আপনার নিকটে পৌঁছাতে না পারে।

জেনে রাখুন, যারা আপনার সাথে লড়াই করতে আসবে এবং আপনাকে গ্রেফতার করতে চাইবে আপনার জন্য তাদের সাথে লড়াই করাটা বেশ কয়েকটি কারণে শরীয়তসম্মত। যে গুলোর মধ্যে প্রতিটি কারণই এর বৈধতা দেয়ার জন্য যথেষ্ট।

যে সব কারণে লড়াই করা বৈধ

প্রথম কারণ:

আত্মরক্ষা করা, ইসলাম আপনাকে কোনো জালেমের সামনে আত্মসমর্পণ করার নির্দেশ দিবে তো দূরের কথা ইসলাম তো নিজের সম্পদ কাউকে দিয়ে দেয়াকেও সমর্থন করে না। জান তো এর চেয়ে কত দামী।

দ্বিতীয় কারণ:

মুরতাদদের তৈরি বিধান আপনার উপর জারি করা থেকে বাধা প্রদান করা। কারণ, ইসলাম উঁচু ও সম্মানিত, (কারও সামনেই) নিচু হয় না। (ইসলামের অনুসারীদের ওপর একমাত্র ইসলামের বিধানই জারি হবে। অন্য কারোটা না)

তৃতীয় কারণ:

আসল কাফেরদের তৈরি বিধান আপনার উপর জারি করা থেকে বাধা প্রদান করা।

কারণ, আসল কাফেরের কাছে আত্মসমর্পণ করা আর তার দোসরের কাছে আত্মসমর্পণ করার মধ্যে তেমন কোনো পার্থক্য নেই।

চতুর্থ কারণ:

মুজাহিদদের গোপন তথ্যগুলো রক্ষা করা এবং জিহাদী সংগঠনের নিরাপত্তা রক্ষা করা।

পঞ্চম কারণ:

ফেতনা থেকে পলায়ন করা এবং কারাগারের কঠিন শাস্তি থেকে আত্মরক্ষা করা।

এ মাসআলায় শরীয়তের মূলনীতি, নসূস এবং বিধি-বিধানের উৎসস্থল ইত্যাদি সবই এই সিদ্ধান্তের ব্যাপারে একমত। তাতে কোনও ধরনের মতবিরোধ নেই। অতএব কোনো ভীতু কাপুরুষের চোখে নিদ্রা না আসুক।

আমরা আল্লাহ তা'আলার নিকট দোয়া করি, তিনি যেন মুজাহিদদেরকে সাহায্য করেন এবং ইসলাম ও মুসলিমদেরকে সম্মানিত করেন। শিরক ও মুশরিকদেরকে লাঞ্ছিত করেন। ইহুদি, খ্রিষ্টান, তাগুত ও মুরতাদসহ দ্বীনের সকল শত্রুদেরকে ধ্বংস করেন।

আমরা আল্লাহ তা'আলার নিকট শাহাদাত কামনা করি যুদ্ধের ময়দানে অগ্রসরমান অবস্থায়, পৃষ্ঠ প্রদর্শনকারী রূপে নয় এবং আল্লাহর নিকট শুভ সমাপ্তি কামনা করছি।

আল্লাহ তা'আলা রহমত বর্ষণ করুন তাঁর বান্দা ও রসূল মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর এবং তাঁর পরিবার পরিজন ও সাহাবায়ে কেরামের উপর এবং কিয়ামত পর্যন্ত যারা সঠিকভাবে তাদের অনুসরণ করবে তাদের উপর। আমীন।

আব্দুল্লাহ বিন নাসির আর রাশীদ

২৩ রজব ১৪২৪ হিজরি